বাঙালীর হাসির গল্প

জসীম উদ্‌দীন

বাঙ্গালীর হাসির গল্প

[দ্বিতীয় খন্ড]

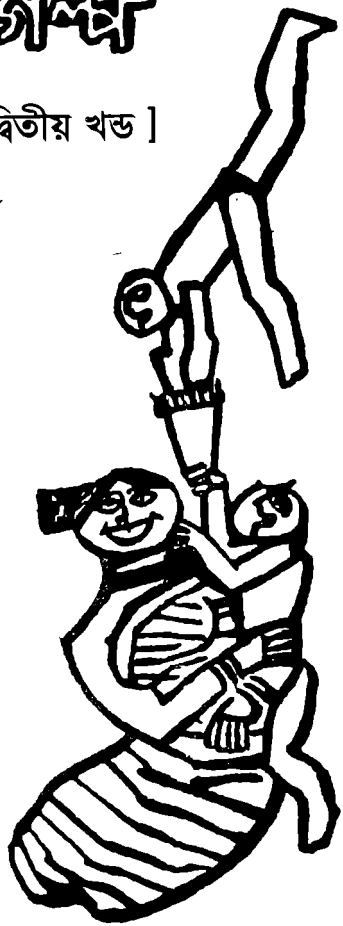

জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি)

Bangaleer Hashir Galpa
by
Jasim Uddin

প্রকাশক :
বেগম জসীমউদ্‌দীন
পলাশ প্রকাশনী
১০ কবি জসীমউদ্‌দীন রোড
ঢাকা

প্রচ্ছদপট :
কাইয়ুম চৌধুরী

রেখাচিত্র :
মোস্তফা মনোয়ার

প্রকাশকাল :
আষাঢ়–১৩৭১
দ্বিতীয় সংস্করণ– আষাঢ়, ১৩৭৩
তৃতীয় সংস্করণ– কার্তিক, ১৩৭৫
চতুর্থ সংস্করণ– বৈশাখ, ১৩৮১
পঞ্চম সংস্করণ– জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯
ষষ্ঠ সংস্করণ– আষাঢ়, ১৩৮৬, জুন ১৯৮৯
সপ্তম সংস্করণ– মার্চ, ১৯৯৭

মূল্য :
❑ শোভন ১০০.০০ টাকা

❑ **US $ 10**

পলাশ প্রকাশনীর যেকোনো বই প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, পুনঃপ্রকাশ, চলচ্চিত্রায়ণ বা রূপান্তরকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নকল বা ছাপানোর প্রয়াস পাইলে তাহা বাংলাদেশ গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য। গ্রন্থস্বত্ব আইন নিবন্ধন নং ৪১৬৩–কপার ২২শে এপ্রিল ১৯৯২ইং।

খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পলাশ প্রকাশনী
১০ কবি জসীমউদ্‌দীন রোড, ঢাকা
FAX : 0088-02-883132

ISBN 984-460-023-5

এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ ইংরেজি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

সূচিপত্র

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১।	আট কলা	১
২।	বোকা সাথী	৬
৩।	হেনতেন	১৩
৪।	টিপ্‌টিপানী	১৯
৫।	অনুস্বার বিসর্গ	২৪
৬।	নবাব সাহেবের দুর্গাপূজা দর্শন	২৬
৭।	একটা কথায় এত	৩০
৮।	চৈত্র মাসের মশ্‌লা পৌষ মাসে	৩৩
৯।	শেয়ালের পাটশালা	৩৬
১০।	আমাদেরটাই তো পথ দেখাইল	৪২
১১।	নাকের বদলে নরুন পাইলাম	৪৪
১২।	তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি	৪৯
১৩।	পান্তা বুড়ী	৫২
১৪।	পুতা লইয়া যাও	৫৭
১৫।	কে আগে শূলে যাইবে	৬০
১৬।	রহিমুদ্দীর ভাইর বেটা	৬৫
১৭।	কে বাঘ মারিল	৬৮
১৮।	দুই গাধা	৭২
১৯।	কোন্ দেশে বোকা নাই	৭৪
২০।	জোলার বুদ্ধি	৮১
২১।	ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি	৮৮
২২।	কিছুমিছু	৯৫
২৩।	প্রহারেণ ধনঞ্জয়	৯৯
২৪।	শেয়ালসা পীরের দরগা	১০২

উৎসর্গ

বাঙ্গালীর হাসির গল্পের অনুবাদিকা

মিসেস্ বারবারা পেইণ্টার

ও

মিষ্টার কারভেল পেইণ্টার

করকমলেষু

আট কলা

রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ। কোনো কাজে একটু এদিক-ওদিক হইলেই সে তার বউকে ধরিয়া বেদম মারে। সেদিন বউ সকালে সকালে উঠিয়া ঘর-দোর ঝাঁট দিতেছে, রহিম ঘুম হইতে উঠিয়া বলিল, "আমার হুঁকায় পানি ভরিয়াছ?" বউ বলিল, "তুমি তো ঘুমাইতেছিলে, তাই হুঁকায় পানি ভরি নাই। এই এখনই ভরিয়া দিতেছি।" রহিম চোখ গরম করিয়া বলিল, "এত বেলা হইয়াছে, তবু হুঁকায় পানির ভর নাই! দাঁড়াও, দেখাইতেছি তোমায় মজাটা।" এই বলিয়া সে যখন বউকে মারিতে উঠিয়াছে, বউ বলিল, "দেখ যখন-তখন তুমি আমাকে মার ধর কর, আমি কিছুই বলি না। জান আমরা মেয়ে জাত? আট কলা হেকমত আমাদের মনে মনে। ফের যদি মার তবে আট কলা দেখাইয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া রহিম শেখের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে একটা লাঠি লইয়া বউকে মারিতে মারিতে বলিল, "ওরে শয়তানী, দেখা দেখি তোর আট কলা কেমন? তুই কি ভাবিয়াছিস্ আমি তোর আট কলাকে ডরাই?"

বহুক্ষণ বউকে মারিয়া রহিম মাঠের কাজ করিতে বাহির হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বউ মনে মনে একটি মতলব আঁটিল। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সহজেই মিটিয়া যায়। দুপুরে রহিম ভাত খাইতে আসিলে বউ রহিমের কাছে জানিয়া লইল, কাল সে কোন ক্ষেতে হাল বাহিবে। বিকাল হইলে বউ বাড়ির কাছের এক জেলেকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "জেলে ভাই! কাল ভোর হওয়ার কিছু আগে তুমি আমাকে একটি তাজা শোলমাছ আনিয়া দিবে। আমি তোমাকে

এক টাকা আগাম দিলাম। আরও যদি লাগে তাও দিব। শেষ রাতে আমি জাগিয়া খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিব। তখন তুমি গোপনে শোলমাছটি আমাকে দিয়া যাইবে।"

গ্রামদেশে একটি শোলমাছের দাম বড়জোর আট আনা। এক টাকা পাইয়া জেলে মনের খুশীতে বাড়ি ফিরিল। সে এ-পুকুরে জাল ফেলে ও-পুকুরে জাল ফেলে। কত টেংরা, পুঁটি, পাবদা মাছ জালে আটকায় ; কিন্তু শোলমাছ আর আটকায় না। রাত যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সত্য সত্যই একটি শোলমাছ তাহার জালে ধরা পড়িল। তাড়াতাড়ি মনের খুশীতে সে মাছটি লইয়া রহিম শেখের বাড়ির খিড়কি-দরজায় আসিল। বউ তো আগেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাছটি লইয়া বউ তাড়াতাড়ি যে ক্ষেতে রহিম আজ লাঙল বাহিবে সেখানে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল।

সকাল হইলে রহিম ক্ষেতে আসিয়া লাঙল জুড়িল। সে এদিক হইতে লাঙলের ফাড়ি দিয়া ওদিকে যায়, ওদিক হইতে এদিকে আসে। হঠাৎ তাহার লাঙলের তলা হইতে একটি শোলমাছ লাফাইয়া উঠিল। রহিম আশ্চর্য হইয়া মাছটি ধরিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর বউকে বলিল, "লাঙলের তলায় এই তাজা শোলমাছটি পাইলাম। খোদার কি কুদরত! এই মাছের কিছুটা ভাজা করিবে, আর কিছুটা তরকারি করিবে। অনেকদিন মাছ-ভাত খাই না। আজ পেট ভরিয়া মাছ-ভাত খাইব।"

এই বলিয়া রহিম ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। দুপুর হইতে না হইতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে বউ-এর কাছে খাইতে চাহিল। বউ একথালা ভাত আর কয়েকটা মরিচ-পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।

একে তো ক্ষুধায় তাহার শরীর জ্বলিতেছে, তাহার উপর এই মরিচ-পোড়া আর ভাত দেখিয়া রহিমের মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে চোখ গরম করিয়া বলিল, "সেই শোলমাছ কি করিয়াছিস্ শীগ্‌গীর বল?" বউ যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল, "কই, মাছ কোথায়? তুমি কি আজ বাজার হইতে মাছ কিনিয়াছ?"

রহিম বলিল, "কেন, আমি যে আজ ইটা-ক্ষেত হইতে শোল-মাছটা ধরিয়া আনিলাম।" বউ উত্তর করিল, "বল কি? ইটা-ক্ষেতে কেহ কখনো শোলমাছ ধরিতে পারে? কখন তুমি আমাকে শোলমাছ আনিয়া দিলে? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে?"

তখন রহিমের মাথায় রাগের আগুন জ্বলিতেছে। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে শয়তানী! এমন মাছটা তুই নিজে রাঁধিয়া খাইয়া আমার জন্য রাখিয়াছিস্ মরিচ-পোড়া আর ভাত! দেখাই তোর মজাটা!" এই বলিয়া রহিম বউকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। বউ চিৎকার করিয়া সমস্ত পাড়ার লোক জড় করিয়া ফেলিল, "ওরে তোমরা দেখরে, আমার সোয়ামী পাগল হইয়াছে, আমাকে মারিয়া ফেলিল।"

বউ-এর চিৎকার শুনিয়া এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে বহুলোক আসিয়া জড় হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এত চেঁচামেচি করিতেছ কেন? তোমাদের কি হইয়াছে?" রহিম বলিল, "দেখ ভাই সকলরা! আজ আমি একটা তাজা শোলমাছ ধরিয়া আনিয়া বউকে দিলাম পাক করিতে। এই রাক্ষসী সেটা নিজেই খাইয়া ফেলিয়াছে। আর আমার জন্য রাখিয়াছে এই মরিচ-পোড়া আর ভাত। আপনারাই বিচার করেন এমন বউ-এর কি শাস্তি হইতে পারে?"

বউ তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনাদের সকলের। আপনারা ভালোমতো পরীক্ষা করিয়া দেখেন আমার সোয়ামীর মাথা খারাপ হইয়া সে যা'তা' বলিতেছে কিনা? ওর কাছে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, ও কোথা হইতে মাছ আনিল, আর কখন আনিল?"

রহিম বলিল, "আজ সকালে আমি ঐ ইটা-ক্ষেতে যখন লাঙল দিতেছিলাম তখন একটি এত বড় শোলমাছ আমার লাঙলের তলে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। সেইটি ধরিয়া আনিয়া বউকে রান্না করিতে দিয়াছিলাম।"

বউ পাড়ার সবাইকে বলিল, "আপনারা সবাই বলুন, শুকনা মাঠে তাজা শোলমাছ কেমন করিয়া আসিবে? আমার সোয়ামী পাগল না হইলে এমন কথা বলিতে পারে?"

গাঁয়ের লোকেরা সকলেই বলাবলি করিল, "রহিম শেখের ইটা-ক্ষেতের ধারে-পাশে কোনো ইঁদারা-পুকুর নাই। সেখানে শোলমাছ আসিবে কোথা হইতে? রহিম নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে।" তখন তাহারা যুক্তি করিয়া রহিমকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেল। সে যখন বাধা

দিতেছিল, সকলে তখন তাহাকে কিল-থাপ্পর মারিতেছিল। একজন বলিল, "পানিতে চুবাইলে পাগলের পাগলামী সারে। চল ভাই, একে

পুকুরে লইয়া গিয়া কিছুটা চুবাইয়া আনি।" যেই কথা সেই কাজ। সকলে ধরিয়া রহিমকে খনিকটা পুকুরে চুবাইয়া আনিল। রহিম বাধা দিতে চাহে, কিন্তু কার বাধা কে মানে।

রহিম রাগে শোষাইতে লাগিল। তখন একজন বলিল, "উহাকে আজই পাগলা গারদে লইয়া যাও। নতুবা রাগের মাথায় কাকে খুন করিয়া ফেলে বলা যায় না।"

রহিমের বউ বলিল, "আপনারা আজকের মতো ওকে খামের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া যান। কাল যদি না সারে পাগলা গারদে লইয়া যাইবেন।"

গাঁয়ের লোকেরা তাহাই করিল। রহিমকে ঘরের একটি খামের সাথে কষিয়া বাঁধিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গেল।

সবলোক চলিয়া গেলে বউ রহিমের হাতের-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাছ-ভাতের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিল। সদ্য পাক করা মাছের তরকারির গন্ধ সারাদিনের না খাওয়া রহিমের নাকে আসিয়া লাগিল। সে মাথা নীচু করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। পাখার বাতাস করিতে করিতে বউ বলিল, "দেখ, আমরা মেয়ে-জাত, আট কলা বিদ্যা জানি; তার-ই এক কলা আজ তোমাকে দেখাইলাম। তাতেই এত কাণ্ড! আর বাকী সাত কলা দেখাইলে কি যে হইত বুঝিতেই পার।"

রহিম বলিল, "দোহাই তোমার, আর সাত কলার ভয় দেখাইও না। এই আমি কছম কাটিলাম। এখন হইতে আর যদি তোমার গায়ে হাত তুলি তখন যাহা হয় করিও।"

বোকা সাথী

এক নাপিত। তার সঙ্গে এক জোলার খুব ভাব। নাপিত লোককে কামাইয়া বেশী পয়সা উপার্জন করিতে পারে না। জোলাও কাপড় বুনিয়া বেশী লাভ করিতে পারে না। দুই জনেরই খুব টানাটানি। আর টানাটানি বলিয়া কাহারও বউ কাহাকে দেখিতে পারে না। এটা কিনিয়া আন নাই, ওটা কিনিয়া আন নাই বলিয়া বউরা দিনরাতই কেবল মিটির মিটির করে। কাঁহাতক আর ইহা সহ্য করা যায়।

একদিন জোলা যাইয়া নাপিতকে বলিল, "বউ-এর জ্বালায় আর তো বাড়িতে টিকিতে পারি না।"

নাপিত জবাব দিল, "ভাইরে! আমারও সেই কথা। দেখনা আজ পিছার বাড়ি দিয়া আমার পিঠের ছাল আর রাখে নাই।"

জোলা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ভাই, ইহার কোনো বিহিত করা যায় না?"

নাপিত বলে, "চল ভাই, আমরা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাই। সেখানে বউরা আমাদের খুঁজিয়াও পাইবে না; আর জ্বালাতনও করিতে পারিবে না।"

সত্য সত্যই একদিন তাহারা দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া চলিল।

এদেশ ছাড়াইয়া ওদেশ ছাড়াইয়া যাইতে যাইতে তাহারা এক বিজন বন-জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এমন সময় হালুম হালুম করিয়া এক বাঘ আসিয়া তাদের সামনে খাড়া। ভয়ে জোলা তো ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে।

নাপিত তাড়াতাড়ি তার ঝুলি হইতে একখানা আয়না বাহির করিয়া বাঘের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "এই বাঘটা তো আগেই ধরিয়াছি। জোলা! তুই দড়ি বাহির কর– সামনের বাঘটাকেও বাঁধিয়া ফেলি।"

বাঘ আয়নার মধ্যে তার নিজের ছবি দেখিয়া ভাবিল, "এরা না জানি কত বড় পালোয়ান। একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আবার আমাকেও বাঁধিয়া রাখিতে দড়ি বাহির করিতেছে।" এই না ভাবিয়া বাঘ লেজ উঠাইয়া দে চম্পট।

জোলা তখনও ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে। বনের মধ্যে আঁধার করিয়া রাত আসিল। ধারে-কাছে কোনো ঘর-বাড়ি নাই। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে বাঘের পেটে যাইতে হইবে। সামনে ছিল একটা বড় গাছ। দুইজনে যুক্তি করিয়া সেই গাছে উঠিয়া পড়িল।

এদিকে হইয়াছে কি? সেই যে বাঘ ভয় পাইয়া পালাইয়া গিয়াছিল, সে যাইয়া আর সব বাঘদের বলিল, "ওমুক গাছের তলায় দুইজন পালোয়ান আসিয়াছে। তাহারা একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমাকেও বাঁধিতে দড়ি বাহির করিতেছিল। এই অবসরে আমি পালাইয়া আসিয়াছি। তোমরা কেহ ওপথ দিয়া যাইও না।"

বাঘের মধ্যে যে মোড়ল– সেই জাঁদরেল বাঘ বলিল, "কিসের পালোয়ান? মানুষ কি বাঘের সাথে পারে ? চল, সকলে মিলিয়া দেখিয়া আসি।"

জঙ্গী বাঘ–সিঙ্গি বাঘ–মামদু বাঘ–খুঁতখুঁতে বাঘ–কুতকুতে বাঘ– সকল বাঘ তর্জন-গর্জন করিয়া সেই গাছের তলায় আসিয়া পৌঁছিল। একে তো রাত আন্ধারী, তার উপরে বাঘের হুঙ্কারী– অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ জ্বলিতেছে। তাই না দেখিয়া জোলা তো ভয়ে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির। নাপিত যত বলে, "জোলা! একটু সাহসে ভর কর!" জোলা ততই কাঁপে। তখন নাপিত দড়ি দিয়া জোলাকে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল।

কিন্তু তাহারা গাছের আগডালে আছে বলিয়া বাঘ তাহাদের নাগাল পাইতেছে না। তখন জাঁদরেল বাঘ আর সব বাঘদের বলিল, "দেখ তোরা একজন আমার পিঠে ওঠ– তার পিঠে আর একজন ওঠ– তার পিঠে আর একজন ওঠ– এমনি করিয়া উপরে উঠিয়া হাতের থাবা দিয়া এই লোক দু'টিকে নামাইয়া লইয়া আয়।" এইভাবে একজনের পিঠে আর একজন– তার পিঠে আর একজন করিয়া যেই উপরের বাঘটি জোলাকে ছুঁইতে যাইবে, অমনি ভয়ে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দড়িসমেত জোলা তো মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। উপরের ডাল হইতে নাপিত বলিল, "জোলা! তুই দড়ি দিয়া মাটির উপর হইতে জাঁদরেল বাঘটিকে আগে বাঁধ, আমি উপরের দিক হইতে একটা একটা করিয়া সবগুলি বাঘকে বাঁধিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া নিচের বাঘ ভাবিল আমাকেই তো আগে বাঁধিতে আসিবে। তখন সে লেজ উঁচাইয়া দে দৌড়– তখন এ বাঘের উপরে পড়ে ও বাঘ, সে বাঘের উপরে পড়ে আর এক বাঘ।

নাপিত উপর হইতে বলে, "জোলা মজবুত করিয়া বাঁধ– মজবুত করিয়া বাঁধ। একটা বাঘও যেন পালাইতে না পারে।" সব বাঘই তখন পালাইয়া সাফ।

বাকী রাতটুকু কোনোরকমে কাটাইয়া পরদিন সকাল হইলে জোলা আর নাপিত বন ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় নাপিত জোলাকে সঙ্গে লইয়া রাজার সামনে যাইয়া হাজির। "মহারাজ প্রণাম হই!"

রাজা বলিলেন, "কি চাও তোমরা?"

নাপিত বলিল, "আমরা দুইজন বীর পালোয়ান। আপনার এখানে চাকরি চাই।"

রাজা বলিলেন, "তোমরা কেমন বীর তা পরখ না করিলে তো চাকরি দিতে পারি না? আমার রাজবাড়িতে আছে দশজন কুস্তিগীর, তাহাদের যদি কুস্তিতে হারাইতে পার তবে চাকরি মিলিবে।"

নাপিত বলিল, "মহারাজের আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাহাদের হারাইয়া দিব।"

তখন রাজা কুস্তি পরখের একটি দিন স্থির করিয়া দিলেন। নাপিত বলিল, "মহারাজ! কুস্তি দেখিবার জন্য তো কত লোক জমা হইবে। মাঠের মধ্যে একখানা ঘর তৈরি করিয়া দেন। যদি বৃষ্টি-বাদল হয়, লোকজন সেখানে যাইয়া আশ্রয় লইবে।"

রাজার আদেশে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড খড়ের ঘর তৈরি হইল। রাত্রে নাপিত চুপি চুপি যাইয়া তাহার ক্ষুর দিয়া ঘরের সমস্ত বাঁধন কাটিয়া দিল। প্রকান্ড খড়ের ঘর কোনোরকমে থামের উপরে খাড়া হইয়া রহিল।

পরদিন কুস্তি দেখিতে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে। রাজা আসিয়াছেন–রাণী আসিয়াছেন–মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র কেহ কোথাও বাদ নাই।

মাঠের মধ্যখানে রাজবাড়ির বড় বড় কুস্তিগীরেরা গায়ে মাটি মাখাইয়া লড়াইয়ের সমস্ত কায়দাগুলি ইস্তেমাল করিতেছে।

এমন সময় কুস্তিগীরের পোশাক পরিয়া নাপিত আর জোলা মাঠের মধ্যখানে উপস্থিত। চারিদিকের লোকে তাহাদের দেখিয়া হাততালি দিয়া উঠিল।

নাপিত তখন জোলাকে সঙ্গে করিয়া লাফাইয়া একবার এদিকে যায় আবার ওদিকে যায়। আর ঘরের এক একখানা চালা ধরিয়া টান দেয়। হুমড়ি খাইয়া ঘর পড়িয়া যায়। সভার সব লোক অবাক।

রাজবাড়ির কুস্তিগীরেরা ভাবে, "হায় হায়, না জানি ইহারা কত বড় পালোয়ান। হাতের একটা ঝাঁকুনি দিয়া এত বড় আটচালা ঘরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাদের সঙ্গে লড়িতে গেলে ঘরেরই মতো উহারা আমাদের হাত-পাগুলোও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। চল আমরা পালাইয়া যাই।"

তাহারা পালাইয়া গেলে নাপিত তখন মাঠের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! জলদী করিয়া আপনার পালোয়ানদের ডাকুন। দেখি! তাহাদের কার গায়ে কত জোর।"

কিন্তু কে কার সঙ্গে কুস্তি করে? তাহারা তো আগেই পালাইয়াছে। রাজা তখন নাপিত আর জোলাকে তাঁর রাজ্যের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতির চাকরি পাইয়া জোলা আর নাপিত তো বেশ সুখেই আছে। এর মধ্যে কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া রাজ্যে মহা উৎপাত লাগাইয়াছে। কাল এর ছাগল লইয়া যায়, পরশু ওর গরু লইয়া যায়, তারপর মানুষও লইয়া যাইতে লাগিল।

রাজা তখন নাপিত আর জোলাকে বলিলেন, "তোমরা যদি এই বাঘ মারিতে পার তবে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে তোমাদের দুইজনের বিবাহ দিব।"

নাপিত বলিল, এ আর এমন কঠিন কাজ কি ? তবে আমাকে পাঁচ মণ ওজনের একটি বড়শি আর গোটা আষ্টেক পাঁঠা দিতে হইবে।"

রাজার আদেশে পাঁচ মণ ওজনের একটি লোহার বড়শি তৈরি হইল। নাপিত তখন লোকজনের নিকট হইতে জানিয়া লইল, কোথায় বাঘের উপদ্রব বেশি, আর কোন্ সময় বাঘ আসে।

তারপর নাপিত সেই বড়শির সঙ্গে সাত আটটা পাঁঠা গাঁথিয়া এক গাছি লোহার শিকলে সেই বড়শি আটকাইয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। তারপর জোলাকে সঙ্গে লইয়া গাছের আগ ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাঘ আসিয়া সেই বড়শিসমেত পাঁঠা গিলিতে যাইয়া বড়শিতে আটকাইয়া গিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। সকাল হইলে লোকজন ডাকিয়া নাপিত আর জোলা লাঠির আঘাতে বাঘটিকে মারিয়া ফেলিল।

রাজা ভারি খুশী। তারপর ঢোল-ডগর বাজাইয়া নাপিত আর জোলার সঙ্গে তাঁহার দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের পরে বউ লইয়া বাসর ঘরে যাইতে হয়। জোলা একা বাসর ঘরে যাইতে ভয় পায়। নাপিতকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করে।

নাপিত বলে, "বেটা জোলা! তোর বাসর ঘরে আমি যাইব কেমন করিয়া ? আমাকেও তো আমার বউ-এর সঙ্গে ভিন্ন বাসর ঘরে যাইতে হইবে। তুই কোনো ভয় করিস না। খুব সাহসের সঙ্গে থাকিবি।" এই বলিয়া জোলাকে বাসর ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

বাসর ঘরে যাইয়া জোলা এদিকে চায়– ওদিকে চায়। আহা-হা কত ঝাড়–কত লণ্ঠন ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। আর বিছানা ভরিয়া কত রঙের ফুল। জোলা কোথায় বসিবে তাহাই ঠিক করিতে পারে না। তখন অতি শরমে পাপোশখানার উপর কুচিমুচি হইয়া বসিয়া জোলা ঘামিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে হাতে পানের বাটা লইয়া, পায়ে সোনার নুপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজাইয়া পঞ্চসখী সঙ্গে করিয়া রাজকন্যা আসিয়া উপস্থিত। জোলা তখন ভয়ে জড়সড়। সে মনে করিল, হিন্দুদের কোনো দেবতা যেন তাহাকে কাটিতে আসিয়াছে। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাজকন্যার পায়ে পড়িয়া বলিল, "মা ঠাকরুন। আমার কোনো অপরাধ নাই। সকলই ঐ নাপতে বেটার কারসাজি।" রাজকন্যা সকলই বুঝিতে পারিল। কথা রাজার কানেও গেল। রাজা তখন জোলা আর নাপিতকে তাড়াইয়া দিলেন। নাপিত রাগিয়া বলে, "বোকা জোলা। তোর বোকামীর জন্য অমন চাকরিটা তো গেলই– সেই সঙ্গে রাজকন্যাও গেল।" জোলা নাপিতকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তা গেল–গেল! চল ভাই, দেশে যাইয়া বউদের লাথিগুতা খাই। সে তো গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। এমন সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে থাকার চাইতে সেই ভালো।

অল্প বয়সেই আজিজের বাপ-মা মরিয়া গেল। বুড়ো নানা আজিজকে আনিয়া তাঁহার বাড়িতে রাখিলেন। কিন্তু তাহার মতো দুষ্ট ছেলেকে সামাল দিবেন কতদিন? আজ এটা নষ্ট করে– কাল ওটা বাজারে বিক্রি করিয়া মেঠাই খায়। অনেক ধকম-ধামক মারপিট করিয়াও আজিজকে ভালো করা গেল না। পরিশেষে নানা তাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

দশ বারো বৎসর পরে একদিন অনেক টাকা-পয়সা লইয়া আজিজ দেশে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া শহরে একটি বাড়ি কিনিয়া ফেলিল। তারপর নানা-নানীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তাহার হাতে আঙটি, ঘড়ি, পরনে দামী কাপড়। নানা-নানী তো দেখিয়া অবাক!

নানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে আজিজ! বিদেশে যাইয়া তুই এত টাকা-পয়সা কামাই করিলি কি করিয়া?"

আজিজ উত্তর করিল, "নানা। ওসব জিজ্ঞাসা করিবেন না। টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়াছি হেনতেন করিয়া।"

নানা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে নাতী! বল না হেনতেন কাকে বলে?"

আজিজ বলিল, "সে কথা আর একদিন বলিব নানা। আজ থাক।"

আজিজ চলিয়া গেল। কিন্তু নানার মনে কেবলই জাগে, হেনতেন কাকে বলে? আচ্ছা, নাতীর মতো হেনতেন করিয়া নানা নিজের অবস্থা আরও ভালো করিতে পারে না? ভাবিয়া ভাবিয়া নানার আর

ঘুম হয় না। সেদিন আজিজকে নানা ডাকিয়া আনিলেন ; বড় লোক নাতীর জন্য নানী অনেক পিঠা-পায়েস করিয়াছেন। নানা নাতী দুইজনে বসিয়া খাইতেছেন, নানা তখন কথাটা পাড়িলেন, "হ্যারে আজিজ! সেদিন না বলিয়াছিলি হেনতেন কাকে বলে অন্য সময় বলবি? আজ তোকে কিছুতেই ছাড়িব না। হেনতেন কাকে বলে তোকে বলিতেই হইবে?"

একটা পিঠা চিবাইতে চিবাইতে আজিজ বলিল, "নানা? আজ ওকথা থাক। পরে একদিন বলিব।"

নানী বলিলেন, "আর একদিন কেন নাতী? তোমার নানা যখন জানিতে চান, আজই বল না কেন, ভাই? হেনতেন কাকে বলে আমারও জানিবার ইচ্ছা।"

আজিজ বলিল, "আচ্ছা নানী! হেনতেন কাকে বলে আমি শুধু মুখেই বলিব না। আপনাদিগকে দেখাইয়া দিব। আমাকে শুধু এক মাসের সময় দিন।"

একটু কি ভাবিয়া আজিজ আবার বলিল, "নানা! একটা কথা! নানী তো সারা জীবন আপনার সংসারে খাটিয়া খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে নানীকে আমার শহরের বাড়িতে কিছুদিন রাখিয়া সবকিছু দেখাইয়া আনি।"

এ কথা শুনিয়া নানী নাতীর উপর খুব খুশী হইলেন। নানার মুখের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন, নানা কি জবাব দেন।

নানা বলিলেন, "সে তো ভালো কথা ভাই! আমার তো আর কোনো আত্মীয়-স্বজন নাই, যেখানে যাইয়া তোমার নানী দুইদিন বিশ্রাম করিয়া আসিবে। তুমি বড়লোক নাতী, লইয়া যাও তোমার নানীকে। কয়েক দিন শহরের যা কিছু দেখিয়া আসুক।" নানীকে সঙ্গে লইয়া আজিজ তাহার শহরের বাসায় আসিল। নানার বাড়ি হইতে শহর পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে।

কিছুদিন পরে শহর হইতে আসিয়া আজিজ কাঁদ কাঁদ হইয়া নানাকে বলিল, "নানা! দুঃখের কথা আর বলিব কি! একদিনের

কলেরা হইয়াই নানী মরিয়া গিয়াছেন। আপনাকে যে খবর দিব তাহারও সময় পাইলাম না। ডাক্তার-কবিরাজের বাড়ি ঘুরিয়াই শরীর কাহিল করিয়া ফেলিলাম।"

নানা কিছুদিন বউ-এর জন্য খুব কাঁদিলেন। তারপর ঘর-সংসারের কাজে মন দিলেন।

আজিজ শহরের বাড়িতে যাইয়া তার নানীকে বলিল, "নানী। দুঃখের কথা কি বলিব! বসন্ত রোগ হইয়া একদিনেই নানা মরিয়া গিয়াছেন।" শুনিয়া নানী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে আজিজ! শীগ্‌গীর আমাকে বাড়িতে রাখিয়া আয়।" আজিজ আরও কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "নানী! আপনাদের গ্রামে আরও দুই তিন জনের বসন্ত হইয়াছে। সেখানে গেলেই আপনাকে বসন্ত রোগে ধরিবে। কিছুতেই আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিব না।"

চার পাঁচ দিন কাঁদিয়া কাটিয়া নানী আবার আগের মতোই খাওয়া-দাওয়া করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে আজিজ আসিয়া তাহার নানার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "নানা! আর কতদিন একলা সংসার সামলাইবেন ? এই বুড়ো বয়সে কে দেয় আপনার ভাত-পানি, আর কে লয় আপনার খবরাখবর ?"

কয়েকদিন হাত পুড়াইয়া রান্না করিয়া খাইয়া নানা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। নাতীর কথায় একেবারে গলিয়া গেলেন, "তাই তো রে ভাই! এই বুড়ো বয়সে ঘর সংসারের কাজ করিতে করিতে একেবারে নাজেহাল হইয়া পড়িয়াছি।"

সুযোগ বুঝিয়া আজিজ বলিল, "নানা! আমার বাসার ধারে একেবারে নানীর মতো দেখিতে একটি বিধবা মেয়ে আছে। নানীর মতো বয়সী। বলেন তো তার সঙ্গে আপনার বিবাহের জোগাড় করিতে পারি।"

নানা বলিলেন, "নারে ভাই, এই বুড়ো বয়সে কাকে আনিয়া দিবি, জানি না, চিনি না, আমার ঘর-সংসার নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিবে।"

আজিজ বলিল, "নানা! ওসব চিন্তা করিবেন না। আমার বাসার কাছে বলিয়া সর্বদা মেয়েটিকে দেখিতে পাই। তার চাল-চলন একেবারে নানীর মতো। আপনি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না মেয়েটি নানী ছাড়া অপর কেহ।"

নানা তখন বলিলেন, "আচ্ছা তোর যদি ইচ্ছা হয় তবে বিবাহের বন্দোবস্ত কর।"

আজিজ বলিল, "নানা! খালি হাতে তো বিবাহ হয় না। কনে পক্ষ আবার শরীফ ঘর। অন্ততঃ হাজার টাকা না হইলে এই বিবাহের কাজে নামা যায় না।"

নানা গণিয়া গণিয়া নাতীর হাতে হাজার টাকার নোট দিলেন।

বাসায় আসিয়া আজিজ তাহার নানীকে বলিল, "নানী। এইভাবে বিধবা হইয়া আপনি আর কতদিন থাকিবেন? আমাকে তো জানেনই। আমার মতিগতির কোনো ঠিক নাই। যা টাকা-পয়সা আছে ফুরাইলে আবার বিদেশ চলিয়া যাইব। তখন আপনার কি উপায় হইবে?"

নানী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তাই তো রে ভাই! আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কুল-কিনারা পাই না।"

আজিজ বলিল, "অমুক গ্রামে একজন বুড়ো লোক দেখিয়াছি। একেবারে নানার মতো দেখিতে। অবস্থা বেশ ভালো। অল্পদিন হইল তাহার বউ মরিয়াছে। আপনি যদি বলেন, তাহার সঙ্গে আপনার বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে পারি।"

শুনিয়া নানী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, "আরে হতভাগা! আমার কি এখন বিয়ার বয়স আছে?"

আজিজ বলিল, "সেই বুড়ো লোকটারও কি বিয়ার বয়স আছে? তবে দিনে দিনে আপনি যখন আরও কমজোর হইয়া পড়িবেন তখন আপনার দেখাশুনা করিবে কে? নানী! আপনি তো আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না– সেই লোকটার চলন-বলন, হাবভাব, গায়ের রং একেবারে নানার মতো। প্রথমে দেখিলে তাহাকে অপর লোক বলিয়া

চিনিতেই পারিবেন না।"

নানী বলিলেন, "তোর নানার মতো যদি দেখিতে হয়, তবে কর বিয়ার জোগাড়।"

শুভদিনে শুভক্ষণে নানা বিবাহের পোশাক পরিয়া পাল্‌কিতে চড়িয়া কয়েকজন বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া নাতীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাজী-বন্দুক ফুটাইয়া নাতী বুড়ো নওসাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

শা-নজরের সময় নানা নানীকে চিনিতে পারিলেন। নানীও নানাকে চিনিতে পারিলেন। দুইজনে দুইজনকে পাইয়া ভারি খুশী।

তবুও নানা আজিজকে ডাকিয়া ধমকাইয়া বলিলেন, "ওরে লক্ষ্মীছাড়া! এই তোর কীর্তি!"

হাসিতে হাসিতে আজিজ আসিয়া নানাকে বলিল, "নানা, হেনতেন কা'কে বলে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাই হেনতেন কা'কে বলে আপনাদিগকে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিলাম।"

টিপ্‌টিপানী

এক তাঁতী। তাঁত চালাইয়া পেটের ভাত জোটে না। কাপড় বুনাইয়া যা লাভ হয়, সূতার দাম দিতে দিতেই তার প্রায় সবটা খরচ হইয়া যায়। তাঁতী ভাবিল, তাঁত-খুঁটি বেচিয়া যদি একটি ঘোড়া কিনিতে পারি তবে ঘোড়ায় করিয়া বেপারীদের মাল এ-বাজারে ও-বাজারে লইয়া গিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

তাই সে তিন টাকায় তাঁত-খুঁটি বেচিয়া হাটে আসিল ঘোড়া কিনিতে। কিন্তু একটা ঘোড়ার দাম দুইশ' তিনশ' টাকা। তিন টাকায় কে তাহার কাছে ঘোড়া বিক্রি করিবে ? তখন সে ভাবিল, তিন টাকা দিয়া সে একটি ঘোড়ার বাচ্চা কিনিবে ; কিন্তু একটা ঘোড়ার বাচ্চার দামও তিরিশ চল্লিশ টাকার কম না। তার টেঁকে আছে মাত্র তিনটি টাকা। ভাবিল যদি সে একটি ঘোড়ার ডিম কিনিতে পারে, সেই ডিম হইতে ঘোড়ার বাচ্চা হইবে। একটা ঘোড়ার ডিমের দাম আর কত হইবে? নিশ্চয় তিন টাকার বেশি নয়।

কিন্তু ঘোড়ার কি কখনো ডিম হয় ? সে ঘোড়া-ওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের কাছে ঘোড়ার ডিম আছে?" তাহারা হাসিয়া কেহ তাহার গায়ে কুটা ছড়াইয়া দেয়– কেহ বালু ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাঁতী ঘোড়ার ডিম না কিনিয়া কিছুতেই বাড়ি ফিরিবে না। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই ঘোড়ার ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করে।

আগেকার দিনে হাটে বাজারে কতকগুলি ট্যাটন থাকিত। তাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়াইত।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁতী এক ট্যাটনের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে ঘোড়ার ডিম আছে।" ট্যাটন বলিল, "আছে। দাম পাঁচ টাকা।"

তাঁতী তাহার হাতখানা ধরিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "ভাই! আমার কাছে মাত্র তিনটি টাকা আছে। ইহা লইয়াই তোমার ঘোড়ার ডিমটি আমাকে দাও।"

ট্যাটন একটি পাকা বাঙ্গী আনিয়া তাঁতীকে দিয়া বলিল, "এটিকে তাড়াতাড়ি বাড়ি লইয়া যাও। ফাটিলেই ইহার ভিতর হইতে ঘোড়ার বাচ্চা বাহির হইবে।"

তিন টাকা দিয়া বাঙ্গীটি কিনিয়া তাঁতী হনহন করিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

খানিকদূরে আসিয়া তাঁতী সামনে দেখিল একটি পুকুর। সে বাঙ্গীটি এক জায়গায় রাখিয়া মুখহাত ধুইতে সেই পুকুরের পানিতে নামিল।

এর মধ্যে বাঙ্গীটি ফাটিয়া গিয়াছে। ফাটা বাঙ্গীর গন্ধ পাইয়া এক শেয়াল আসিয়া সেই বাঙ্গী খাইতে লাগিল। মুখহাত ধুইয়া আসিয়া তাঁতী অবাক হইয়া দেখিল, তাহার ঘোড়ার ডিম ফাটিয়া বেশ বড়সড় একটা বাচ্চা বাহির হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দড়ি লইয়া শেয়ালের পিছে পিছে দৌড়। কিন্তু মানুষ শেয়ালের সঙ্গে দৌড়াইয়া পারিবে কেন? শেয়াল দৌড়াইয়া এক জঙ্গলের ভিতর ঢুকিল।

তখন রাত্র হইয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার। এখন বাড়ি ফিরিয়া যাওয়াও মুস্কিল। সেই জঙ্গলের ধারে ছিল এক বুড়ীর বাড়ি। তাঁতী বুড়ীকে যাইয়া বলিল, "বুড়ীমা। আজকার রাতের মতো আমাকে তোমার বাড়িতে থাকিতে দিবে?"

বুড়ী ভালো লোক। তাঁতীকে থাকিবার জন্য কাছারী ঘরে কাঁথা-বালিশ আনিয়া দিল।

কিন্তু তাঁতীর আর ঘুম আসে না। সে দড়িগাছি হাতে লইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল। যদি তার ঘোড়ার বাচ্চা এই পথ দিয়া যায়, তাড়াতাড়ি তাহার গলায় দড়ি লাগাইয়া টানিয়া ধরিয়া রাখিবে।

শেষরাত্রে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। এমন সময় বাঘ আসিয়া ঘরের পিছনে ওঁৎ পাতিয়া বসিল। বাঘ সুযোগ খুঁজিতেছিল কি করিয়া একলাফে যাইয়া তাঁতীকে খাইয়া ফেলিবে।

অন্ধকারে সব তো ভালোমতো চেনা যায় না! তাঁতী ভাবিতেছিল, ওই বাঘটিই তাহার ঘোড়ার বাচ্চা। সে দড়ি হাতে লইয়া বসিয়া বসিয়া ফন্দী আঁটিতেছিল কি করিয়া তার ঘোড়ার বাচ্চাটিকে বাঁধিয়া ফেলিবে।

বুড়ীর এক নাতনী বুড়ীর সঙ্গে ঘুমাইত। সে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দাদী, ওই ঘরে আমার পুতুল আছে শিগ্‌গীর আনিয়া দাও।"

দাদী বলিল, "একে তো বাঘের ভয়। তার উপরে টিপটিপানী! এখন ঘুমাইয়া থাক। সকাল হইলেই তোর পুতুল আনিয়া দিব।"

বুড়ীর কথা শুনিয়া বাঘের তো আক্কেল গুড়ুম। টিপ্‌টিপানী অর্থে বুড়ী বলিয়াছিল টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ার কথা। বাঘ ভাবিল টিপটিপানি যেন কি এক জন্তু! বাঘের চাইতেও জোরওয়ার! বাঘ তখন লেজ উঁচাইয়া দে দৌড়। তাঁতী মনে করিল ঘোড়ার বাচ্চা পালাইয়া যায়। সে পিছে পিছে দৌড়াইয়া একেবারে বাঘের পিঠে উঠিয়া সওয়ার হইয়া বসিল। বাঘ মনে করিল, সেই টিপ্‌টিপানী বুঝি তাহার পিঠে আসিয়া বসিয়াছে। তখন সে প্রাণের ভয়ে দৌড়াইয়া এদিকে যায়–ওদিকে যায়। তাঁতী আরও শক্ত করিয়া দুই হাতে বাঘের ঝুটি ধরিয়া রাখে। কিছুতেই বাঘ তাহাকে পিঠ হইতে নামাইতে পারে না। এমনি করিয়া ভোর হইল। চারিদিক আলো হইল। তাঁতী দেখিল, সর্বনাশ! এ তো তাহার ঘোড়ার বাচ্চা নয়, বাঘ! তখন ভয়ে তাঁতী কাঁপিতে লাগিল। বাঘ কিন্তু আগের মতোই এদিকে দৌড়াইতেছে, ওদিকে দৌড়াইতেছে। এইভাবে বাঘ যখন একটি বড় গাছের তলায়

আসিয়াছে, তাঁতী তখন লাফ দিয়া গাছের ডালে গিয়া উঠিল। বাঘ উঠি তো পড়ি, পড়ি তো উঠি করিয়া দৌড়াইয়া পালাইল।

এদিকে হইয়াছে কি, বাঘ যাইয়া তার দলের আর সব বাঘকে বলিল, "এই বনে টিপ্‌টিপানী আসিয়াছে। আজ সারারাত আমার পিঠে চড়িয়া আমাকে হয়রান করিয়াছে। তোমরা সকলে সাবধানে চলাফেরা করিবে, টিপ্‌টিপানী যেন ধরে না। সে এখন গাছের উপর বসিয়া আছে।"

শুনিয়া দলের যে বুড়ো বাঘ সে বলিল, "আমরা বাঘ, বনের সব চাইতে জোরওয়ার। আমাদের চাইতে জোরওয়ালা আবার কে আসিল? চল তো দেখিয়া আসি, কেমন সেই টিপ্‌টিপানী!"

এঁড়ে বাঘ, হেড়ে বাঘ, ধেড়ো বাঘ, কুতকুতানি বাঘ, মিন্ মিনানি বাঘ, জ্বরো বাঘ, কেশোবাঘ, সব বাঘ একত্র হইয়া কেউ কাঁথামুড়ি দিয়া, কেউ মাথায় ভাঙ্গা হাঁড়ির টোপর পরিয়া সেই গাছের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বুড়োবাঘ নজর করিয়া দেখিল সেই গাছের উপরের ডালে জোলা দড়ি হাতে লইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু অত উপরের ডাল তো বাঘের নাগালের বাইরে। তখন সেই বুড়োবাঘ, তার কাঁধে একটা বাঘ, সেই বাঘের কাঁধে আর একটা বাঘ, তার কাঁধে আর একটা বাঘ উঠিয়া, শেষ বাঘটা যখন জোলাকে ছুঁইছুঁই তখন ভয়ে জোলা দড়িসমেত গাছ হইতে গিয়াছে পড়িয়া। নিচের বুড়োবাঘ ভাবিল, টিপ্‌টিপানী বুঝি আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে আসিয়াছে। সে তখন উঠিয়া পড়িয়া দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধের উপর হইতে আর আর বাঘগুলি দুড়ুম, দাড়ুম করিয়া পড়িয়া গেল। তাহারাও বুড়োবাঘের সঙ্গে দৌড়াইয়া পালাইল। তাঁতী কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ির পথে পা বাড়াইল।

অনুস্বার বিসর্গ

একজনের দুই জামাই। বড় জামাই সংস্কৃত পড়িয়া মস্তবড় পণ্ডিত! ছোট জামাই মোটেই লেখাপড়া জানে না। তাই বড় জামাই যখন শ্বশুর বাড়ি আসে, সে তখন আসে না।

সেবার পূজার সময় শ্বশুর ভাবিলেন, দুই জামাইকে একত্র করিয়া ভালোমতো খাওয়াই। তাছাড়া তাদের দুইজনের সঙ্গে তো আলাপ পরিচয় থাকা উচিত। কিন্তু বড় জামাইর কথা শুনিলে ছোট জামাই আসিবে না। তাই বড় জামাইর আসার কথা গোপন করিয়া সে ছোট জামাইকে নিমন্ত্রণ দিল।

ছোট জামাই শ্বশুর বাড়ি আসিয়া শুনিল বড় জামাইও আসিতেছে। হায়! হায়! কি করিয়া সে বড় জামাইর সংগে কথাবার্তা বলিবে! সে শুনিয়াছে বড় জামাই সংস্কৃত ছাড়া কথাই বলে না। বড় জামাই তখন বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িয়াছে ; শালা-শালীদের মুখে এই খবর শুনিয়া ছোট জামাই ভয়ে খাটের তলায় যাইয়া লুকাইয়া রহিল।

বড় জামাই আসিয়া শালা-শালীদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলিতে লাগিল। শালা-শালীরাও দুই এক কথায় সংস্কৃতেই তাহার উত্তর দিতেছিল। সংস্কৃত ভাষায় প্রায় প্রতি শব্দেই একটা অনুস্বার বা বিসর্গ থাকে। বড় জামাইর মুখে সংস্কৃত শুনিয়া সে ভাবিল, অনুস্বার বিসর্গ দিলেই যদি সংস্কৃত হয় তবে সে খাটের নিচে বসিয়া আছে কেন?

সে খাটের তলা হইতে বলিয়া উঠিল–

"অনুস্বরং দিলেং যদিং সংস্কৃতং হং,

তবেং কেনং ছোটং জামাইয়ং খাটেরং তলেং রং ?”

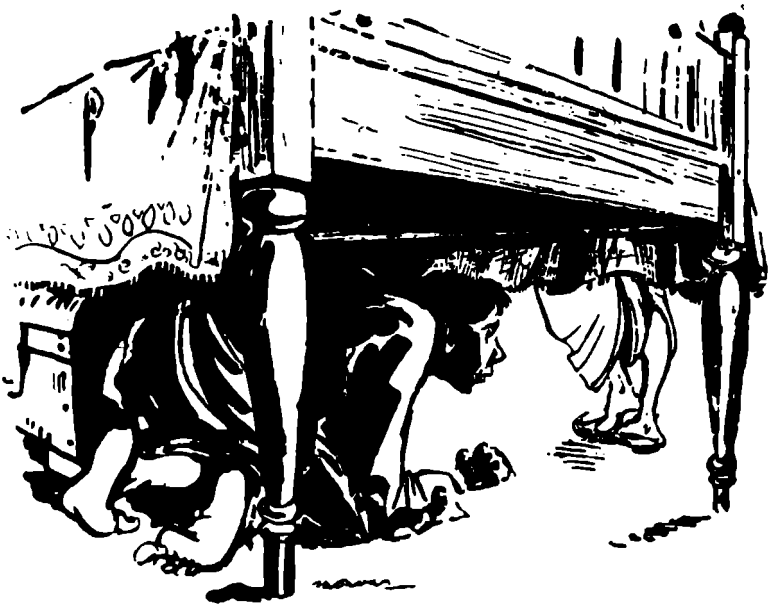

শুনিয়া শালা-শালীরা তাহাকে খাটের তলা হইতে উঠাইয়া আনিল। ছোট জামাইর সংস্কৃত শুনিয়া বড় জামাই মৃদু হাসিল।

নবাব সাহেবের দুর্গাপূজা দর্শন

পশ্চিম ভারতে নবাব সাহেবের জমিদারী। সেখানে চাকরি করে কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু। তাহারা বহুদিন বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে।

সেবার আশ্বিন মাসে তাহারা ঠিক করিল, "এবার আমরা দুর্গাপূজা করিব।" বাঙ্গলা দেশ ছাড়া কোথাও দুর্গাপূজা হয় না। তাহারা বাঙ্গলা দেশ হইতে কুমার ডাকিয়া আনিয়া দুর্গা-প্রতিমা গড়াইল।

পূজার কয়েকদিন আগে তাহারা বলাবলি করিল, "দেখ রে, নবাব সাহেবের অধীনে আমরা চাকরি করি। তিনি এমন ভালোমানুষ। তাঁকে আমাদের পূজায় নিমন্ত্রণ করিব।"

যেই বলা, সেই কাজ। তাহারা তিন চারজনে যাইয়া নবাব সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

নবাব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে বাঙ্গালী বাবুরা যে, তা কি মনে করিয়া?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "সামনের রবিবারে আমরা মায়ের পূজা করিব। তাই আপনাকে নিমন্ত্রণ দিতে আসিয়াছি।"

নবাব সাহেব খুশী হইয়া বলিলেন, "তোমরা বাঙ্গালী বাবুরা খুব ভালো আদমী আছ? তোমরা মায়ের পূজা কর। মার চাইতে বড় দুনিয়ায় আর কে আছে? আমি জরুর তোমাদের দাওয়াতে যাইব।"

শুভদিনে শুভক্ষণে নবাব সাহেব একখানা লাঠি হাতে করিয়া বাঙ্গালী বাবুদের মায়ের পূজা দেখিতে আসিলেন। তাহারা অতি

তাজিমের সঙ্গে নবাব সাহেবকে দুর্গা-প্রতিমার সামনে লইয়া গিয়া এটা-ওটা ভালোমতো বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

"এই যে আমাদের মা, তিনি দশহাতে দশদিক রক্ষা করিতেছেন। মায়ের দুই পাশে তাঁর দুই মেয়ে– লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

দেখিয়া নবাব সাহেব খুব খুশী। "তোমাদের মায়ের দুই বেটী ভারি খুবসুরৎ আছে। জেতা রহ বেটী, জেতা রহ।"

উৎসাহ পাইয়া তাহারা নবাব সাহেবকে আরও দেখাইল, লক্ষ্মী সরস্বতীর দুইপাশে কার্তিক আর গণেশ, মায়ের দুই ছেলে।

নবাব সাহেব বলিলেন, "এরা তো খুব বীর আছে। জেতা রহ, বেটা জেতা রহ।"

এই বলিয়া নবাব সাহেব কার্তিক গণেশকে আশীর্বাদ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার নজর পড়িল দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে কালো একটা অসুর,–

নবাব সাহেব লাঠি দিয়া অসুরের মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এ বেটা কে আছে?"

বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন বলিল, "এটি অসুর! অনেক অনেক বছর আগে এই অসুর দুনিয়ার উপরে বহু অত্যাচার করিত। তাহার অত্যাচারে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। আমাদের মা এই অসুরের সাথে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন।"

নবাব সাহেবের রাগ এখন চরমে উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি লাল হইয়াছে। "এ বদমাস অসুর জানানা লোকের সাথ্ এখনও লড়াই করতে আছে। আরে বদমাশ তোমার জান কবচ করে দেই।" বলিতে বলিতে নবাব সাহেব হাতের লাঠিখানা লইয়া দুই তিন বাড়িতে অসুরের মূর্তিটা ভাঙিয়া ফেলিলেন।

দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে অসুরের মূর্তিও একটি অংশ। এটি না থাকিলে পূজা ঠিকমতো হয় না। শুভ কাজের এই বাধায় সমস্ত বাঙ্গালীর মুখ কালো হইয়া উঠিল।

নবাব সাহেব ভাবিয়াছিলেন, বদমাশ অসুরের মূর্তি ভাঙ্গিয়া তিনি বাঙ্গালীদিগকে খুব খুশী করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কালো মুখ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যায়া, তোমরা বেজার হইয়াছ কেন ?"

বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন হাত জোড় করিয়া বলিল, "নবাব সাহেব! আপনি মূর্তির একটি অংশ ভাঙিয়াছেন বলিয়া এটি দিয়া আর আমাদের পূজা হইবে না।"

নবাব সাহেব তখন পকেট হইতে হাজার টাকার একখানা নোট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই টাকা দিয়া ফির মূর্তি বানাও কিন্তু ওই বদমাশ অসুরকে না বানাও, ও পুরুষ হয়ে জানানার সাথ্ লড়াই করতে আসে।"

হাজার টাকা পাইয়া বাঙ্গালী বাবুরা খুব খুশী। বাঙ্গলা দেশ হইতে আনানো কুমার তখনও দেশে ফিরে নাই। তাড়াতাড়ি তাকে ডাকিয়া ভাঙা প্রতিমাটি আবার নূতন করিয়া জোড়া দেওয়াইল। অসুর না হইলে তো পূজা হয় না। কুমারকে বলিযা তাহারা দুর্গার পাশে

এতটুকু একটা অসুর গড়াইয়া লইল। সেটি এত ছোট যে নবাব সহেবের নজরে আসিবে না। ভাঙা প্রতিমা জোড়া দিতে তাহাদিগকে কুমারকে আরও চার পাঁচ টাকা বেশী দিতে হইল। নবাব সাহেবের দেওয়া সেই হাজার টাকার কতক দিয়া তাহারা দুই দিন যাত্রাগান শুনিল, আর বাকী টাকা দিয়া সন্দেশ-রসগোল্লা কিনিয়া ছেলেমেয়ে-বউ-ঝি লইয়া মহা আনন্দে ভুরি ভোজন করিল।

একটা কথায় ব্রত

জামাই শ্বশুরবাড়ি যাইয়া কোনো কথা বলে না। শালীরা-শালারা কত ঠাট্টা-তামাসা করিতে আসে ; সে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। শ্বশুর যাইয়া জামাইয়ের বাপকে বলে, "দেখুন, আপনার ছেলে আমাদের বাড়ি আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোনো কথাবার্তা বলে না। এটা যেন কেমন কেমন লাগে। সবাই বলে জামাই বোকা।"

বাপ বলিল, "আমার ছেলে তো বাড়িতে বেশ ভালোমতো কথাবার্তা বলে! আচ্ছা, তাকে আমি বেশ করিয়া ধমকাইয়া দিব।"

বাড়ি আসিয়া বাপ ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "কিরে শ্বশুরবাড়ি যাইয়া কথাবার্তা বলিস্ না কেন? সেখানে যাইয়া সকলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবি। শালা-শালীদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করবি। তবেই না লোকে বলিবে, বেশ ভালো জামাই!"

ছেলে মাথা নত করিয়া রহিল। বাপ বুঝিল, এবার ছেলে শ্বশুর বাড়ি যাইয়া তাহার উপদেশ মতো কাজ করিবে।

ঈদের ছুটিতে জামাই শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। আসিয়া বৈঠক-খানার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শ্বশুর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবাজী! চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন ? বাড়িতে সবাই ভালো আছে তো?"

জামাই উত্তর করিল, "ভালো আর আছে কই? কয়দিন হইল আমার বাপের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। হাতে একখানা লাঠি লইয়া যাকে দেখেন তাকেই মারিতে আসেন।"

শ্বশুর বলিল, "তবে তো খুব খারাপ কথা! আমি কালই তোমার বাবাকে দেখিতে যাইব।"

জামাই বলিল, "শ্বশুর সাহেব! যাইবেন যে, খুব সাবধানে যাইবেন। একখানা লাঠি হাতে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইবেন। আমার বাবা যদি আপনাকে মারিতে আসেন, লাঠি উঠাইয়া তাঁহাকে মারিতে যাইবেন! দুই একটা লাঠির ঘা মাথায় পড়িলে বাবা শান্ত হইয়া যাইবেন। তারপর আর কিছু বলিবেন না।"

শ্বশুর বলিল, "আচ্ছা, তাহাই করিব। কাল সকালে তোমার বাবাকে দেখিতে যাইব।"

জামাই শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। বাপ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, শ্বশুর বাড়ি যাইয়া এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসলি কেন?"

ছেলে বলিল, "ফিরিয়া না আসিয়া উপায় কি ? আমার শ্বশুরের মাথা খারাপ হইয়াছে। যাকে দেখেন তাকেই লাঠি ঘুরাইয়া মারিতে আসেন।"

বাপ বলিল, "তবে তো খুব খারাপ খবর! কাল সকালে তোর শ্বশুরকে দেখিতে যাইব।"

ছেলে বলিল, "আপনি যে যাইবেন, খুব সাবধানে যাইবেন। একখানা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইবেন। আমার শ্বশুর যদি আপনাকে মারিতে আসেন, লাঠির কায়েক ঘা তাঁহার গায়ে মারিবেন, তিনি তখনই থামিয়া যাইবেন। কিন্তু কয়েক ঘা না মারিলে তিনি আপনাকে মারিতেই থাকিবেন। সাবধান! সঙ্গে লাঠি না লইয়া যাইবেন না।"

পরদিন সকালে দুই গ্রাম হইতে বাপ আর শ্বশুর লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইল। মাঝপথে আসিয়া দুই বিয়াইয়ের সাথে দেখা। শ্বশুর লাঠি উঁচাইয়া বলিল, "এই!" বাপ তেমনি লাঠি ঘুরাইয়া বলিল, "এই!" তারপর দুই বিয়াইতে লাঠি পেটাপেটি আরম্ভ হইল। সে কি যেমন তেমন মারামারি! পাড়ার লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া দুই বিয়াইকে আলাদা করিয়া ধরিয়া রাখিল। তারপর বলিল, "তোমাদের হইল কি ?

দুই বিয়াইয়ের মধ্যে এমন ভাব-মহব্বত। এখন এইভাবে তোমাদের মারামারি করার কারণ কি ?”

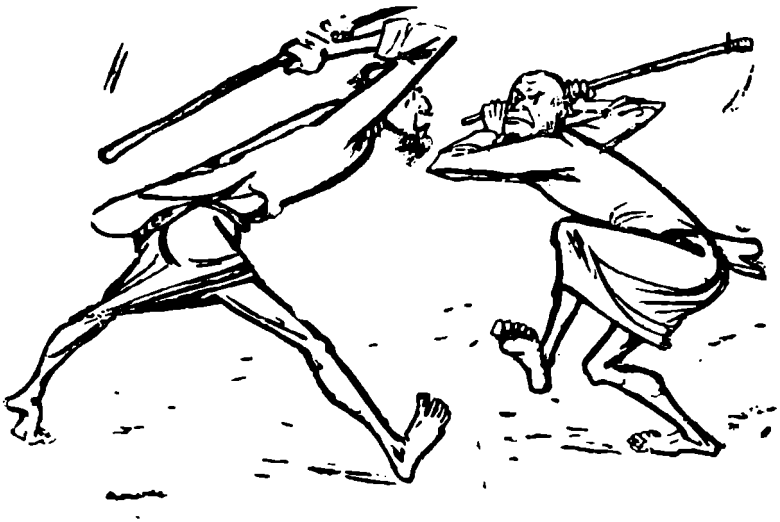

শ্বশুর তখন বলিল, “কাল জামাইয়ের মুখে শুনিলাম বিয়াই পাগল হইয়া গিয়াছে। যাকে দেখে তাকেই মারিতে আসে। আর লাঠি দিয়া দুই এক ঘা মারিলেই নীরব হইয়া যায়।”

বাপ বলিল, “ওই শয়তান ছেলে বিয়াইয়ের বিষয়েও এমনি কথা আমাকে বাড়ি আসিয়া বলিয়াছে।”

এখন এ-বিয়াই ও-বিয়াই একে অপরের সঙ্গে আলাপ করিয়া সমস্ত জানিতে পারিল। বাপ বাড়ি ফিরিয়া ছেলেকে ধমক দিয়া বলিল, “ওরে বেল্লিক, বেহায়া! তোর শ্বশুর সম্বন্ধে এমন মিথ্যাকথা আমাকে বলিয়াছিলি কেন ?”

ছেলে বিনীতভাবে উত্তর করিল, “আপনি আমাকে শ্বশুরবাড়ি যাইয়া কথাবার্তা বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেখানে যাইয়া একটি মাত্র কথা বলিয়াছি, তাহাতেই এত! অনেক কথা বলিলে না জানি কি হইত ?”

চৈত্র মাসের মসলা পৌষ মাসে

মৌলবী সাহেবের তালেব এলেম (ছাত্র) সবে মৌলবী হইয়াছেন। ছাত্র অবস্থায় ওস্তাদের বক্তৃতায় যে যে কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারই মতো সুর করিয়া সেই সব কথা বলেন। নূতন মৌলবীর গলার সুর আরও সুন্দর বলিয়া ঘন ঘন তিনি দাওয়াত পান।

সেবার পৌষ মাসে এক গৃহস্থ বাড়ি তাঁহার দাওয়াত হইয়াছে। বক্তৃতা করিতে করিতে মৌলবী সাহেব বলিয়া ফেলিলেন, "মেয়ে লোকের ব্যবহার করা কোনো কাপড়-পোষাক আলেম ওস্তাদকে দিতে নাই। ইহাতে খুব গুনাহ্ হয়।"

পাড়াগাঁয়ের চাষী মুসলমানদের বাড়িতে মেয়েদের পরার কাপড় দিয়াই সাধারণত শীতকালের কাঁথা তৈরি হয়। কারণ পুরুষদের চাইতে মেয়েদের কাপড় পুরু।

বাড়ির কর্তা গরীব মানুষ, লেপ কিনিবার পয়সা নাই। শীত নিবারণের জন্য কয়েকখানা মাত্র কাঁথা আছে। তাহাও মেয়েদের শাড়ী কাপড় দিয়া তৈরি। তাই রাত্রের আহারের পরে সে মৌলবী সাহেবকে শীত নিবারণের জন্য কিছুই দিতে পারিল না। কারণ মৌলবী সাহেব ওয়াজের সময় বলিয়াছেন, মেয়েলোকের কাপড়ের তৈরি কাঁথা মৌলবী-মাওলানাদের দিতে নাই। দিলে খুব গুনাহ্ হইবে।

শূন্য মাদুরের উপর বসিয়া মৌলবী সাহেব সারারাত শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিয়া কাটাইলেন। একটুকুও ঘুমাইতে পারিলেন না। শুধু কি এই বাড়িতে ? ইহার পর মৌলবী সাহেব যেখানেই দাওয়াত খাইতে যান, কেহই মৌলবী সাহেবকে রাত্রে শুইবার জন্য কাঁথা-

কাপড় দেয় না। কারণ তাহারা আগের সেই চাষীর বাড়িতে মৌলবী সাহেবের ওয়াজ শুনিয়া আসিয়াছে।

শীতের কষ্ট আর কত দিন সহ্য করা যায় ? সারারাত শীতের কাঁপুনীতে না ঘুমাইয়া মৌলবী সাহেবের চোখ দুটি লাল জবাফুল, তার উপর আবার সর্দি-কাশি।

একদিন তিনি তাঁর ওস্তাদ মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "হুজুর! আপনার শিক্ষা মতো আমি সব জায়গায়ই ওয়াজ

করিয়া বেড়াই। কিন্তু এক জায়গায় যাইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি।"

ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মুস্কিল, খোলাসা করিয়া বলো!"

তখন মৌলবী সাহেব জবাব দিলেন, "এক চাষীর বাড়িতে আমি বক্তৃতায় বলিলাম, "স্ত্রীলোকের ব্যবহার করা কোনো কাপড় মৌলবী-, মাওলানাদের দিতে নাই। তাহাতে খুব গুনাহ্ হয়।"

সেই হইতে যে বাড়িতেই আমি দাওয়াত পাই, বাড়ির কর্তা শীতের রাতে আমাকে কোনো কাঁথা-কাপড় দেয় না। এই দেখুন, শীতের রাত্র জাগিতে জাগিতে আমার কি হাল হইয়াছে।"

ওস্তাদ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আরে বেয়াক্কেল। চৈত্র মাসের বক্তৃতা তুমি পৌষ মাসে করিয়াছ। তোমার মতো গাধা আর নাই। কাঁথা-কাপড়ের বক্তৃতা গরমকালের জন্য মূলতবী রাখিবে। আমি কি শীতকালে তোমাকে এরূপ ওয়াজ করিতে বলিয়াছিলাম?"

শেয়ালের পাঠশালা

শেয়াল কিছুদিন হইতে কিছুই খাইবার পায় না। বর্ষাকালে সমস্ত দেশ পানিতে ভরা। গেরস্ত বাড়ি হইতে হাঁস-মুরগী ধরিয়া আনিয়া যে মাঠে লুকাইবে, সেই মাঠ এখন পানিতে ডুবুডুবু। না খাইয়া, না খাইয়া শেয়ালের পেট পিঠের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোথায় খাইবার পাওয়া যায় ? কুমীরের বাচ্চাগুলি নদী দিয়া সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। তাদের ধরিতে পারিলে বেশ মজা করিয়া খাওয়া যাইত ; কিন্তু নদীতে নামিলেই কুমীর আসিয়া তাহাকে ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া একবারে জলপান করিয়া ফেলিবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেয়াল এক ফন্দি বাহির করিল।

নদীর ধারে এক উচুঁ টিলার উপরে ঝাউ গাছের ডাল পুঁতিয়া শেয়াল এক পাঠশালা খুলিল। ইদুঁর, মাকড়সা, আরশোলা, ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাঙ হইল পাঠশালার পড়ুয়া। কয়েকটি জোনাকী ধরিয়া আনিয়া এক নাদা গোবরের সঙ্গে আটকাইয়া রাতের কালে পাঠশালা আলো করা হইল। মাথায় ভাঙ্গা হাঁড়ীর টুপি, বগলে পদ্মপাতার খুঙ্গীপুঁথি, কাঁধে গরুর খুঁটার কলম গুঁজিয়া কাশ ডাটার লাঠি হাতে করিয়া শেয়াল লেজ চাপা দিয়া বসিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিল।

ইঁদুর পড়ে চিকির মিকির চিক, আর দাঁত দিয়া ধান চিবায়। শেয়াল তাকে শিখাইয়া দেয়– কি করিয়া রাতের বেলা গেরস্তের গোলা কাটিয়া কালাই, মসুরি বাহির করিয়া আনিবে। বেড়ালকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া ঘরের কলাটা পেয়ারাটা লইয়া আসিবে।

মাকড়সা তার পেটের ভিতর হইতে সূতা বাহির করে, তারপর এডালে ওডালে সেই সূতা টানাইয়া সুন্দর জাল তৈরি করে। শেয়াল

তাকে শিখাইয়া দেয় কিভাবে সেই জালের এক পাশে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবে, কোনো পোকা উড়িয়া আসিয়া সেই জালে আটকা পড়িলে সে কি করিয়া এক লাফে যাইয়া পোকাটিকে ধরিয়া খাইবে।

আরশোলাকে শিখাইয়া দেয় কি করিয়া সে দেয়ালের বা ঘরের চালার এক পাশে মরার মতো হইয়া চুপটি করিয়া থাকিবে। আর সেই পথে পিঁপড়ে বা ডাশ পোকা আসিলে এক লাফে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া খাইবে। মাকড়সার জালের ধারেও সে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। জালে কিছু আটকাইলে ঠোঁট দিয়া জাল টানিয়া আনিয়া সে পোকাটাকে খাইতে পারিবে, কিন্তু সাবধান ! অত বড় দেহটা লইয়া সে যেন মাকড়সার জালের উপর দিয়া না চলিতে যায়। তাহা হইলে জাল ছিঁড়িয়া সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ করিয়া গান গায়। কত রকমের সুরই তার জানা। সরু, মোটা, মিহি, চড়া কত ভাবেই সে গান করে। কিন্তু গান গাহিলেই তো তার পেট চলিবে না! শেয়াল তাহাকে শেখায়– অনেক রাতে যখন সবাই ঘুমাইয়া পড়ে তখন কি করিয়া চুপি চুপি উঠিয়া কপিগাছের নরম ডোগাগুলি খাইয়া যাইবে।

ব্যাঙকে শেখায় কি করিয়া রাতে-দিনে ঘরের ভিতর হইতে ঝোপের ভিতর হইতে মশা-মাছি ধরিয়া খাইবে, কিন্তু সাবধান! সাপে যেন ধরে না। যদি ধরে, তবে সে এমন চিৎকার করিবে যে, সেই শব্দ শুনিয়া লোকে আসিয়া সাপটিকে মারিয়া ফেলিবে।

ইঁদুর, মাকড়সা, আরশোলা, ঝিঁঝিঁ পোকা, ব্যাঙ সবাই শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়িয়া ভারি খুশী। এতো যেমন তেমন গুরুমশায় নয়! সকল জানোয়ারের চাইতে বেশী চালাক স্বয়ং শেয়াল পণ্ডিত। টিকটিকি টিকটিক করিতে করিতে দেশ-বিদেশে এই পাঠশালার খবর বলে।

ইঁদুরের চিকির মিকির, ব্যাঙের ঘঙর ঘঙর, আর ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ। পড়ুয়াদের পড়ায় সমস্ত কাশবন ওলট পালট। শোনা-

শোনি শেয়ালের এই পাঠশালার খবর কুমীরেরও কানে গেল। কুমীর ভাবিল, তাই তো ইঁদুর, ব্যাঙ, আরশোলা সকলের ছেলেমেয়েই শেয়ালের পাঠশালায় পড়িয়া কত কি শিখিয়া ফেলিল, আর আমার

সাতটি ছেলে কেবল পানির মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়, এখনও মাছটা-আঁশটা ধরিতে শিখিল না।

একদিন কুমীর তার সাতটি বাচ্চাকে সঙ্গে করিয়া শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় আসিয়া হাজির।

"শেয়াল মামা! বাড়ি আছ নাকি ?"

শেয়াল বলিল, "একটু দূরে থাকিয়া কথা বল কুমীর-ভাগনে! তোমাকে দেখিয়া বড় ভয় পাই।"

কুমীর একগাল হাসিয়া বলিল, "মামা! ভয় পাওয়ার কথা নয়! আমার সাতটি ছেলেকে তোমার পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিতে চাই। ওরা বড় দুষ্ট। ওদের কিছু বিদ্যা শিখাইয়া দাও।"

খুশী হইয়া শেয়াল বলিল, "বেশ! বেশ!! ভাগনে, অল্পদিনেই আমি ওদের বিদ্যাদিগ্‌গজ করিয়া দিব।"

কুমীর তার সাতটি বাচ্চাকে শেয়ালের পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিয়া গেল।

পরদিন শেয়াল কুমীরের সাতটি বাচ্চার একটিকে খাইয়া ভোরের নাস্তা করিল। দুপুর বেলা সেই কাশখাগড়ার বনের ধারে নদীতে ভুসুত করিয়া কুমীর আসিয়া ভাসান দিল।

"কি মামা, আমার বাচ্চারা কেমন লেখাপড়া করিতেছে?"

শেয়াল উত্তর করিল, "তারা পড়াশুনায় বেশ মনোযোগী। সাতটি দিন যাইতে দাও ভাগ্‌নে দেখিবে ওদের লেখাপড়ায় কত বড় করিয়া দিই।"

কুমীর বলিল, "ওদের কি একবার দেখিতে পারি না, মামা?"

শেয়াল উত্তর করিল, "কেন দেখিতে পাইবে না ভাগ্‌নে? তুমি ওখানে থাক। আমি একে একে আনিয়া তাহাদের দেখাই।" এই বলিয়া শেয়াল একটি একটি করিয়া পাঁচটি বাচ্চাকে দেখাইয়া একটিকে দুইবার আনিয়া দেখাইল। বোকা কুমীর ভাবিল তার সাতটি বাচ্চাকে দেখিল।

এমনি করিয়া রোজ শেয়াল সকালে কুমীরের এক একটি বাচ্চা খাইয়া নাস্তা করে, আর কুমীর আসিলে একটি বাচ্চাকে বার বার দেখাইয়া তাহাকে বুঝায়। সাতদিনের দিন সকালে বাকী বাচ্চাটিকে খাইয়া শেয়াল পাঠশালার ঘর ভাঙিয়া উধাও।

দুপুর বেলা কুমীর আসিয়া দেখিল, কোথায় মাস্টার, আর কোথায় তার পড়ুয়াদল! শূন্য কাশপাতার বন বাতাসে হেলিতেছে দুলিতেছে। কুমীর সবই বুঝিতে পারিল। নিজের বোকামির জন্য মাথায় থাপ্পড় মারিল। ছেলেদের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। তারপর প্রতিজ্ঞা করিল, "শেয়াল! তুমি আর কোনোদিন নদীতে পানি খাইতে নামিবে না? নদীতে আসিলে ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তোমায় উচিত শিক্ষা দিব।"

শেয়াল আর কুমীরের ভয়ে নদীতে নামে না। নদীর ধারে বালুর উপরে উঠিয়া কাঁকড়াগুলি দল বাঁধিয়া এদিকে-ওদিকে যায়। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া রোদ পোহায়। কতদিন আর লোভ সামলান যায়! ক্ষুধায় পেট খাই খাই করিতেছে।

সেদিন যেই শেয়াল কাঁকড়া ধরিতে নদীর কিনারে আসিয়াছে, অমনি কুমীর ভুসুত করিয়া উঠিয়া শেয়ালের একটি ঠ্যাং ধরিয়া পানিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তারপর শেয়াল কুমীরে টানাটানি, হানাহানি করিতে করিতে তাহারা এক কাশবনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন শেয়াল তাড়াতাড়ি একটি কাশের ডাঁটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ভাগ্‌নে! ধরিলে তো ধরিলে আমার লাঠিগাছা। আমার পা যদি ধরিতে তবেই আমাকে আটকাইতে পারিতে। এই যে আমার পা।" বলিয়া শেয়াল কুমীরের মুখের কাছে লাঠিখানা ধরিল। বোকা কুমীর শেয়ালের ঠ্যাং ছাড়িয়া দিয়া যেই লাঠিখানা ধরিয়াছে, অমনি শেয়াল একলাফে যাইয়া বালুর চরায় উঠিল।

কুমীর তখন বলিল, "আচ্ছা শেয়াল! যাও। একদিন না একদিন তোমাকে পাইবই।"

ইহার পর কুমীর শেয়ালের খোঁজে এখানে ওখানে কতই ঘুরিয়া বেড়ায়। শেয়াল আর কুমীরের ভয়ে পানিতে নামে না।

সেদিন কুমীর করিল কি, বালুর চরার উপর যাইয়া মরার মতো শুইয়া রহিল। দূর হইতে শেয়াল তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, হয়তো কুমীরটি মরিয়াই গিয়াছে। যদি মরিয়া থাকে তবে কুমীরের মাংস খাইয়া কিছুদিন আরামে কাটান যাইবে। কিন্তু তার আগে ভালোমতো জানিতে হইবে কুমীরটা সত্য সত্যই মরিয়াছে কি না।

শেয়াল কুমীরের কাছে আসিয়া বলিল, "কুমীরটা কি মরিয়াছে? যদি মরিয়া থাকে তবে সে পা নাড়া দিবে।"

বোকা কুমীর তখন পা নাড়া দিল।

শেয়াল আবার বলিল, "কুমীর যদি সত্য সত্যই মরিয়া থাকে তবে সে হাত নাড়া দিবে।"

বোকা কুমীর আবার হাত নাড়া দিল।

শেয়াল বলিল, "বেশ বুঝিলাম কুমীরটা মরিয়া গিয়াছে। যাই বালুর চরা হইতে দাঁতে ধার দিয়া আসি। মরা কুমীরটা খাইতে হইবে।"

কুমীর ভাবিল, শেয়াল একবার কাছে আসিলে হয় ; ধরিয়া এক নিমেষে ওকে খাইয়া ফেলিব।" এই বলিযা কুমীর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

দাঁতে ধার দেওয়ার নাম লইয়া শেয়াল ওদিকে গেরস্ত পাড়ায় যাইয়া খবর দিল, "কি চাই, ডাঙার উপর কুমীর আসিয়া শুইয়া আছে।" গেরস্তরা সবাই কুমীরের উপর চটা। কুমীর কাহারও ছেলে খাইয়াছে, কাহারও মেয়ে খাইয়াছে। আর গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া যে কত খাইয়াছে তাহার লেখা-জোখা নাই। তাহারা দল বাঁধিয়া লাঠি, সড়কি, ইট-পাটকেল লইয়া আসিয়া কুমীরটিকে মারিয়া ফেলিল।

আমাদেরটাই ত পথ দেখাইল

রহিম শেখ বড়ই অসাবধান। আজ এটা ভাঙে, কাল ওটা হারায়। এজন্য বউ তাকে কতই বকে। কিন্তু বকিয়া বকিয়াও বউ তাকে সাবধান করিতে পারে না।

সেদিন হাটে যাইবার সময় বউ বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছে, "দেখ আজ হাটে যাইয়া আমার তেলের শিশিটা যেন হারাইয়া আসিও না। এই শিশিটা আমার বাপের বাড়ি হইতে আনিয়াছি, কেমন সুন্দর দেখিতে !"

রহিম তেলের শিশি লইয়া হাটে চলিল। এক জায়গায় বৃষ্টির পানিতে পথ পিছল হইয়া আছে। সেখানে আসিয়া তো পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে হয়। কিন্তু অসাবধান রহিম যেমন চলিতেছিল সেখানে আসিয়াও তেমনি চলিতে লাগিল। আর তখনি পা পিছলাইয়া আছাড় খাইল। হাতের শিশিটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

রহিম তখন ভাবিতে লাগিল, "বাড়ি গেলে বউ যখন জানিতে পারিবে শিশিটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন সে কি জবাব দিবে ? যদি বলে কাদার পথে চলিতে চলিতে পা পিছলাইয়া সে আছাড় খাইয়াছিল, সেই সময় শিশিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন বউ জিজ্ঞাসা করিবে, কাদার পথে চলিতে কেন সাবধান হও নাই ? এ কথার সে কি উত্তর দিবে ?" মনে মনে সে একটি ফন্দি আঁটিয়া বাড়ি আসিল।

বউ তাড়াতাড়ি হুঁকাটি আনিয়া তাহার হাতে দিল। হুঁকা টানিতে টানিতে রহিম গল্প আরম্ভ করিল, "আজিকার হাটে যে গিয়াছে তাহারই তেলের শিশি হারাইয়াছে। কতজন তেলের শিশি হারাইয়া পথে পথে তালাস করিয়া ফিরিতেছে।"

বউ জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, আমাদের তেলের শিশিটা তো হারায় নাই!"

রহিম একটু কাশিয়া উত্তর করিল, "আমাদেরটাই তো পথ দেখাইয়াছে। আমাদের শিশিটা প্রথম হারাইল। তারপর সকলের তেলের শিশিই হারাইতে আরম্ভ করিল।"

নাকের বদলে নরুণ পাইলাম

এক শেয়াল পেটের জ্বালায় অস্থির। বেগুন ক্ষেতে ঢুকিয়া বেগুন খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে হঠাৎ একটি বেগুন কাঁটা শেয়ালের নাকে বিঁধিয়া গেল। শেয়াল এধারে নাক ঘুরায় ওধারে নাক ঘুরায়, বেগুন কাঁটা খোলে না। জিভ্ দিয়া নাকের আগা চাটিতে গেল, কিন্তু জিভ্ নাক পর্যন্ত যায় না। সামনের দু'পা দিয়া নাকের কাঁটা খুলিতে গেল। কিন্তু বেগুন কাঁটা এত সরু যে পায়ের নলি দিয়া ধরা যায় না। কাঁটার ব্যথায় হাচ্য হাচ্য করিতে করিতে শেয়ালের দুই চোখ দিয়া পানি আসিল।

অবশেষে শেয়াল নাপিতের বাড়ি আসিল।

নাপিত ভাই! নাপিত ভাই! বাড়ি আছ নি ?

বেগুন কাঁটা নাকে ফুট্‌ছে করব এখন কি ?

নাপিত বড় ভালো মানুষ। সে নরুনটি হাতে লইয়া শেয়ালের নাক হইতে কাঁটাটি খসাইতে হঠাৎ নরুনের আগা লাগিয়া শেয়ালের নাকের খানিকটা কাটিয়া ফেলিল। শেয়াল তো হুক্কা হুয়া করিয়া রাগিয়া মাগিয়া অস্থির। "ওরে নাপ্‌তে, শিগ্‌গীর আমার নাক জোড়া দিয়া দে। নইলে তোকে মজাটা দেখাব।"

নাপিত হাতজোড় করিয়া বলিল, "মাফ কর ভাই। তোমার কাঁটা তুলিতে হঠাৎ নরুনটা নাকে লাগিয়াছে। আমি তো আগে জানিতে পারি নাই।"

শেয়াল বলিল, "মাফ করিতে পারি, যদি তোর নরুনটা আমাকে দিস্।"

নাপিত আর কি করে। নরুনটা শেয়ালকে দিল। নরুনটা মুখে লইয়া শেয়াল চলিল এপাড়া হইতে আর এক পাড়া কুমার বাড়ির ধার দিয়া।

কুমার বলিল—

"শেয়াল মামা! শেয়াল মামা!
মুখে ওটা কি
একটুখানি দাঁড়াও দেখি
পরখ করে নি।"

শেয়াল দাঁড়াইয়া বলিল, "ওটা নরুন, নাকের বদলে পাইয়াছি।" কুমার বলিল, "দেখি দেখি, কেমন নরুন !" কুমারের হাতে নরুন দিতেই নরুনটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শেয়াল তখন রাগিয়া মাগিয়া বলিল, "ওরে কুমার! লক্ষ্মীছাড়া, আমার নরুনটা ভাঙ্গিয়া দিলি! শিগ্‌গীর জোড়া দিয়া দে। নইলে রাত্রে আসিয়া তোর হাঁড়ি-পাতিল সব ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইব।"

সে গ্রামে কোনো কামার নাই, কি করিয়া সে ভাঙ্গা নরুন জোড়া লাগাইবে? জোড়হাতে কুমার বলিল, "আমাকে মাফ কর ভাই। নইলে গরীব প্রাণে মারা যাই।"

শেয়াল বলিল, "তবে দে, নরুনের বদলে একটা হাঁড়ি দে। তাহাই লইয়া তোকে মাফ করিয়া যাই।"

কুমার খুশী হইয়া শেয়ালকে একটি হাঁড়ি দিল। হাঁড়ি মাথায় লইয়া শেয়াল সে গ্রাম ছাড়িয়া আর এক গ্রাম ছাড়াইয়া এক মাঠের মধ্যে যাইয়া পড়িল। তখন বেশ রাত্র হইয়াছে।

এক বরযাত্রীর দল যাইতেছিল পটকা বাজি জ্বালাইয়া। তাহারই একটি বাজি লাগিয়া শেয়ালের মুখের হাঁড়ি গেল ভাঙ্গিয়া।

রাগিয়া মাগিয়া শেয়াল যাইয়া বরযাত্রীদের ধরিল, "তোমরা পটকা বাজি পোড়াইয়া আমার হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়াছ। শিগ্‌গীর জোড়া দিয়া দাও।

নইলে রাত্রে তোমাদের পাড়ায় ঢুকিয়া মোরগ-মুরগী চুরি করিয়া আনিব। তরমুজ-বাঙ্গী আর খাইতে হবে না। দাঁত দিয়া কামড়াইয়া একাকার করিয়া দিব।"

পাল্কী হইতে বর নামিয়া আসিয়া জোড়হাতে বলিল, "এবারের মতো মাফ কর ভাই।"

শেয়ার বলিল, "মাফ করিতে পারি যদি তোমার কনেটিকে আমায় দিয়া যাও।" বর কি তার বিবাহ করা কনেকে সহজে দিতে চায়! বরযাত্রীরা সকলে বলিল, "শেয়ালের কথা না রাখিলে সে যাইয়া আমাদের খেত-খোলা নষ্ট করিবে। মোরগ-মুরগী ধরিয়া লইবে। সে তো কম লোকসান হইবে না। তার চাইতে কনেটিকেই দিয়া যাও।"

অগত্যা বর কনেটিকে শেয়ালের হাতে দিল। কনে পাইয়া খুশী হইয়া নাচিতে নাচিতে শেয়াল এক ঢুলীর বাড়ি গেল।

"ঢুলী ভাই! এসো এসো ঢোলে ঢোকর দিয়া
আজকের শুভদিনে মুই শেয়ালের বিয়া।"

ঢুলী বলিল, "আমার তো একটা মাত্র ঢোল। বিবাহের সময় তো ঢোল-ডগর, সানাই, কাড়া-নাকড়া কত বাজাইতে হয়। বলো তো আমার দলের লোকদের খবর দেই।"

শেয়াল বলিল, "বেশ! তোমাদের দলের যে কয়জন আছে সকলকে খবর দিতে যাও। আমার কনেটি তোমাদের এখানে থাকিল। আমি এদিকে পুরুত ডাক দিতে যাই। সে আসিয়াই তো বিবাহের মন্ত্র পড়াইবে।"

ঢুলী-বউ কুট্‌না কুটিতেছিল। কনেটি বটির সামনে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ঝিমাইতে ঝিমাইতে হঠাৎ ধারাল বটির উপর পড়িয়া বউটি কাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। পরের বউ এমন করিয়া মারা পড়িল। ভয়ে ঢুলী-বউ কনেটিকে টানিয়া লইয়া খড়-গাদায় লুকাইয়া রাখিল। পুরুত লইয়া শেয়াল আসিয়া দেখে কনে নাই। সে তেড়িয়া মেড়িয়া ঢুলী-বউকে বলে, "শিগ্‌গীর আমার কনে আনিয়া দাও। নইলে দেখাইব মজা।"

জোড়হাত করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ঢুলী-বউ বলে, "আমাকে মাফ করিয়া দাও।"

শেয়াল উত্তর করিল, "মাফ করিতে পারি। যদি আমার কনের বদলে তোমাদের ঢোলটা দাও।"

ঢুলী-বউ তাহাদের ঢোলটা শেয়ালকে দিয়া খুনের দায় হইতে বাঁচিল।

ঢোলটি গলায় ঝুলাইয়া মনের খুশীতে শেয়াল বড় তালগাছটার মাথায় উঠিয়া নাচে আর গান করে–

তাক ধুমা ধুম ধুম।
বেগুন খেতে ফুটল নাকে বেগুন কাঁটা যম
তাক ধুমা ধুম ধুম।
কাঁটা তুলতে কাটল নাক ব্যথা নয় তার কম
তাক ধুমা ধুম ধুম।
নাকের বদলে নরুন পেলাম
তাক ধুমা ধুম ধুম।
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলাম
তাক ধুমা ধুম ধুম।
হাঁড়ির বদলে কনে পেলাম
তাক ধুমা ধুম ধুম।
কনের বদলে ঢোল পেয়েছি
তাক ধুমা ধুম ধুম।

গান গাহিতে গাহিতে আর নাচিতে নাচিতে শেয়াল দিয়াছে এক লাফ আর মাটিতে পড়িয়া চিৎপটাং !

তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি

এক রাখাল ছেলে মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছ তলায় বসিয়া আছে। এমন সময় এক ফকীর আসিয়া তাহাকে বলিল, "বাবা, আমাকে একটু পানি খাওয়াইবে ? আমার বড়ই তেষ্টা পাইয়াছে।"

রাখালটি তাড়াতাড়ি নদীতে যাইয়া এক ঘটি পানি আনিয়া মুসাফিরকে দিল। পানি খাইয়া মুসাফির বড়ই খুশী হইল। যাইবার সময় মুসাফির রাখাল ছেলেটিকে একটি মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া গেল–

"তুমি কেন ঘষ,
আমি তাহা জানি ;
তুমি কেন ঘষ,
আমি তাহা জানি।"

আরও বলিয়া গেল, "তুমি যখন তখন এই মন্ত্রটি জোরে জোরে আওড়াইবে। তোমার কপাল ফিরিয়া যাইবে।"

সেই হইতে রাখাল ছেলেটি যখন তখন এই মন্ত্রটি আওড়ায়। পাড়ার লোকে ভাবে সে পাগল হইয়াছে।

সে দেশের বাদশা বড় ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভিখারীর পোশাক পরিয়া প্রজাদের অবস্থা জানিতে বাহির হইতেন। সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বাদশা দেখিতে পাইলেন কয়েকজন চোর একটি বাড়িতে সিঁদ কাটিতেছিল। সেই পথ দিয়া যাইতে ছেলেটি জোরে জোরে মন্ত্র পড়িল,

"তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি,
তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি।"

অমনি চোরেরা সিঁদ-কাঠি লইয়া উধাও। বাদশা তখন ভাবিলেন, এই রাখাল বালক নিশ্চয় কোনো কেরামতি পাইয়াছে। তারই ফলে সে চোরদের সকল খবর জানিতে পারে।

রাখাল কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে এই মন্ত্রটি শিখিয়াছিল তাহা বাদশাকে জানাইল। তারপর বলিল, "আমার আর কোনোই কেরামতি নাই। আমি শুধু জোরে জোরে এই মন্ত্রটি পড়িয়াছি–

"তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি,
তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি।"

বাদশা রাখাল ছেলেটিকে বহু পুরস্কার দিয়া তাহার নিকট হইতে এই মন্ত্রটি শিখিয়া আসিলেন।

বাদশার উজীর বড়ই খারাপ লোক। সে গোপনে গোপনে বাদশাকে খুন করিয়া নিজে বাদশা হইবার মতলবে ছিল। তাই সে বাদশার নাপিতকে বহু টাকা ঘুষ দিয়া বলিয়া দিল, "তুমি যখন কাল

বাদশার দাড়ি কামাইবে তখন ক্ষুর দিয়া তাঁহার গলা কাটিয়া ফেলিবে।"

নাপিত বহু টাকা ঘুষ পাইয়া উজীরের কথায় রাজী হইল।

পরদিন বাদশার দাড়ি কামাইতে আসিয়া নাপিত দেখিল তাহার ক্ষুরে তেমন ধার নাই। সে পাথরের উপর ঘষিয়া ক্ষুরে ধার দিতে লাগিল।

বাদশা ভাবিলেন, সেই রাখাল বালকের মন্ত্রটি জোরে জোরে আওড়াইয়া দেখি কি ফল হয়। বাদশা মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন–

"তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি,
তুমি কেন ঘষ আমি তাহা জানি।"

তখন নাপিত আর যায় কোথায় ? সে ভাবিল বাদশা তাহাদের গোপন কথা সবই জানিতে পারিয়াছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাদশার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাদশা নামদার, আমার কসুর মাফ করেন। আপনার দুষ্ট উজীর অনেক টাকা পয়সা দিয়া আমাকে আপনার গলা কাটিতে পরামর্শ দিয়াছে।"

বাদশা তখন সবই বুঝিতে পারিলেন। উজীরকে বন্দী করিয়া আনিয়া শাস্তি দিলেন, আর রাখাল বালকটিকে আনিয়া নিজের সভাসদ করিলেন।

পান্তা বুড়ী

পান্তা বুড়ী রোজ পাতিল ভরিয়া ভাত রাঁধে। তার কতকটা খায়, আর কতকটায় পানি ঢালিয়া পান্তা করিয়া রাখে। পানির ঠাণ্ডায় ভাত পচিয়া যায় না। রোজ সকালে উঠিয়া সে সেই পান্তা ভাত খায়।

এক চোর টের পাইয়া রাত্রে বুড়ী ঘুমাইলে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পান্তা খাইয়া যায়। বুড়ী সকালে উঠিয়া সোরগোল করে। চোরের চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া গাল দেয়। শুনিয়া চোর মনে মনে হাসে। রাতের বেলা বুড়ী ঘুমাইলেই সে আবার ঘরে ঢুকিয়া আগের মতোই তাহার পান্তা ভাত খাইয়া যায়। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়।

বুড়ী সকালে উঠিয়া রাজার বাড়ি চলিল নালিশ করিতে।

যাইতে যাইতে বুড়ী দেখিতে পাইল পথের উপর একটি সিঙ্গীমাছ নড়িতেছে। সে বুড়ীকে বলিল, "বুড়ীমা, আমাকে পুকুরে ছাড়িয়া দিয়া যাও। এখানে থাকিলে আমি মরিব।" বুড়ীর বড়ই দয়া হইল। সে মাছটি উঠাইয়া পুকুরে ছাড়িযা দিল।

তারপর হন্‌হন্‌ করিয়া সে পথে যাইতে লাগিল। খানিক যাইয়া দেখিতে পাইল পথের মধ্যে একখানা ছুরি পড়িয়া আছে। ছুরিখানা বুড়ীকে বলিল, "বুড়ীমা, এই পথ দিয়া কত লোক যাইবে, অসাবধানে কেহ আমার উপর পা ফেলিলে পা কাটিয়া যাইবে। আমাকে ওই কাঁটা গাছের মধ্যে ফেলিয়া যাও।"

বুড়ী ছুরিখানা হাতে লইয়া কাঁটাগাছের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

আরও খানিক যাইতে বুড়ী দেখিতে পাইল একটি গাই লতাপাতার মধ্যে জড়াইয়া আছে। গাইটি বলিল, "বুড়ীমা, আমি লতাপাতার মধ্যে

জড়াইয়া আছি। আমাকে ছাড়াইয়া দাও।"

শুনিয়া বুড়ীর দয়া হইল ; সে দুই হাতে লতাপাতা ছিঁড়িয়া দিল। গাইটি খুশী হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ঘাস খাইতে লাগিল।

আরও খানিক যাইতে পথের ধারের একটি বেলগাছ বুড়ীকে ডাকিয়া বলিল, "বুড়ীমা, একটু শুনিয়া যাও।"

বুড়ী থামিয়া বলিল, "কি বলিবে বাছা! শিগ্‌গীর বল। আমি রাজার বাড়ি যাইব। রাজসভা ভাঙ্গিল বলিয়া। শিগ্‌গীর বল কি বলিবে।"

বেলগাছ বলিল, আমার চারিধারে এত আগাছা জন্মিয়াছে যে, আমি ভালো করিয়া দম্ লইতে পারিতেছি না। আর মাটির ভিতরে যা কিছু রস আছে, আগাছারা খাইয়া ফেলে। আমার জন্য কিছু থাকে না। দিনে দিনে আমি শুকাইয়া যাইতেছি।"

শুনিয়া বুড়ীর দয়া হইল। সে বহু কষ্টে বেলগাছের চারিধারের আগাছাগুলি টানিয়া উপড়াইয়া ফেলিল। বেলগাছ ভালো করিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বুড়ীকে দোয়া করিতে লাগিল।

সেখান হইতে বুড়ী আরও তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিল।

রাজসভা তখন ভাঙ্গে ভাঙ্গে। বুড়ী আগাইয়া যাইয়া বলিল, "এক চোর রাত্রে আসিয়া রোজ আমার পান্তাভাত খাইয়া যায়, তুমি ইহার বিচার কর।"

রাজা বলিল, "তুমি যদি চোর ধরিয়া আনিতে পার, আমি তাহার বিচার করিতে পারি। কে তোমার পান্তাভাত খাইয়াছে না জানিয়া কাহার উপর বিচার করিব ?"

রাগিয়া-মাগিয়া বুড়ী বলিল, "তবে তুমি কেমন রাজা হে? চোর ধরিতে পার না ? তোমার আশীগণ্ডা পাহারাদার কি নাকে সর্ষের তেল দিয়া রাতে ঘুমায় ? তাহারা থাকিতে আমার বাড়িতে কেমন করিয়া চোর ঢোকে?"

রাজাকে গাল পাড়িতে পাড়িতে বুড়ী বাড়ি চলিল। বেলগাছের কাছে আসিলে, বেলগাছ জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ীমা ! বড় যে বেজার হইয়া ফিরিয়া চলিয়াছ, খবর কি ?"

বুড়ী উত্তর করিল, "এক চোর আসিয়া রোজ আমার পান্তাভাত খাইয়া যায়। রাজার কাছে গিয়াছিলাম বিচার চাহিতে। রাজা বিচার করিল না।"

বেলগাছ বলিল, "আমার একটি বেল লইয়া যাও, রাত্রে চুলার মধ্যে পোড়া দিয়া রাখিও।" একটি বেল ঝোলার মধ্যে পুরিয়া হন্‌হন করিয়া বুড়ী পথ চলিতে লাগিল।

খানিক যাইতে গাই জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ীমা, বড় যে বেজার হইয়া চলিয়াছ!"

বুড়ী বলিল, "এক চোর আমার পান্তাভাত খাইয়া যায়। রাজার কাছে এর বিচার চাহিয়াছিলাম। রাজা বিচার করিল না।"

গাই বলিল, "আমার একনাদা গোবর লইয়া যাও। তোমার দরজার সামনে রাখিয়া দিও।"

কলাপাতায় করিয়া একনাদা গোবর লইয়া বুড়ী আবার পথ চলিতে লাগিল।

খানিক যাইতে ঝোপের ভিতর হইতে ছুরি জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ীমা, তোমার মুখখানি যে বড় বেজার বেজার?"

বুড়ী বলিল, "এক চোর আসিয়া রোজ রাতে আমার পান্তাভাত খাইয়া যায়। রাজার কাছে গিয়াছিলাম বিচার চাহিতে। রাজা বিচার করিল না।

ছুরি বলিল, "বুড়ীমা! আমাকে লইয়া যাও। গোবর গাদার মধ্যে আমাকে লুকাইয়া রাখিও।"

বুড়ী ছুরিখানা ঝোলার মধ্যে লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। আরও খানিক যাইতে পুকুরের ভিতর হইতে সিঙ্গীমাছ বলিল, "বুড়ীমা! মুখখানা যে বেজার বেজার?"

বুড়ী তাহাকে সব কিছু খুলিয়া কহিল।

সিঙ্গীমাছ বলিল, "বুড়ীমা! আমাকে লইয়া যাও। আমাকে তোমার পান্তাভাতের হাঁড়িতে রাখিয়া দিও।"

বুড়ী সিঙ্গীমাছটি তাহার ঝোলার মধ্যে পুরিয়া লইল। দুপুরের বেলা তখন গড়াইয়া পড়িয়াছে। এত পথ চলিয়া ক্ষুধায় বুড়ীর পেটে আগুন জ্বলিতেছে। সে আরও জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল।

বাড়ি আসিয়া বুড়ী এক পাতিল ভাত রাঁধিয়া কতক খাইল আর কতক সেই হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া পানি ঢালিয়া পান্তাভাত করিল। পানি সমেত সেই পান্তাভাতের মধ্যে সিঙ্গীমাছটিকে ছাড়িয়া দিল। তারপর দরজার সামনে গোবর নাদা রাখিয়া তাহার ভিতরে ছুরিখানা লুকাইয়া রখিল। বেলটি আখার মধ্যে পোড়া দিয়া কাঁথা-কাপড় মুড়ি দিয়া বুড়ী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

এদিকে রাত্রে চোর আসিয়া যেই পান্তাভাতের হাঁড়িতে হাত দিয়াছে, অমনি সিঙ্গীমাছ তাহার হাতে কাঁটা ফুটাইয়াছে। ব্যথার জ্বালায় চোর লাফ দিয়া পালাইবে আর গোবর নাদায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। গোবর নাদায় পড়িয়া যাইতেই ছুরিতে লাগিয়া পা কাটিয়া গেল! পায়ের আঘাতে গোবর ছিটিয়া চোখে মুখে আসিয়া লাগিল। চোর সামনে পুকুরে হাত পা ধুইয়া ভাবিল, বুড়ীর আখার উপর যাইয়া হাত-পা গরম করিয়া লই। যেই সে আখার উপর হাত-পা গরম করিতে গিয়াছে, অমনি বেলটি ফাটিয়া চোরের চোখে-মুখে লাগিয়া ফোস্কা করিয়া দিয়াছে।

বেল ফাটার শব্দ পাইয়া বুড়ী "কে রে! কে রে!" করিয়া জাগিয়া উঠিল। চোর তখন দে দৌড়।

সেই হইতে চোর আর বুড়ীর ত্রিসীমানায় আসে না। মজা করিয়া বুড়ী পান্তাভাত খায় আর সারাদিন বসিয়া ছেঁড়া কাঁথায় জোড়াতালি দেয়।

পুতা লইয়া যাও

হাটে একটি প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ উঠিয়াছে। এক ফকীর ভাবিল, এই বোয়াল মাছটার পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম! সে মাছের দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন চাষী আসিয়া মাছটি কিনিয়া লইল। মুসাফির তাহার পিছে পিছে যাইতে লাগিল। লোকটি যখন বাড়ির ধারে আসিয়াছে তখন মুসাফির তাহার নিকটে যাইয়া বলিল, "সাহেব! আমি মুসাফির লোক। ভিক্ষা করিয়া খাই। কোনোদিন ভালো খাওয়া হয় না। আজ হাটে যাইয়া যখন ঐ বড় মাছটি দেখিলাম, মনে বড় ইচ্ছা হইল এই মাছটির পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম! তাই আপনার পিছে পিছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া যদি আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন বড়ই সুখী হইব।"

লোকটি বড়ই দয়ালু। সে খুব আদর করিয়া মুসাফিরকে আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইল। তারপর মাছটি ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার বউকে মুসাফিরের সমস্ত ঘটনা বলিয়া হুকুম করিল, "এই মাছটির পেটি বেশ পুরু করিয়া কাটিবে। পেটিখানা মুসাফিরকে দিতে হইবে।"

এমন সময় লোকটির একটি গরু ছুটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গরুটির পিছে পিছে দৌড়াইল।

মাছ কুটিতে কুটিতে চাষীর বউ ভাবিল, "বাড়িতে ভালো কিছু খাবার পাক করিলে আমার স্বামী এমনি করিয়া মুসাফির লইয়া আসে। মুরগীর রানটা, মাছের পেটিটা সব সময়ই মুসাফিরদের দিয়া খাওয়ায়। এই বড় মাছের পেটিখানাও মুসাফিরকে খাওয়াইবে। যেমন করিয়াই হোক মুসাফিরকে আজ তাড়াইব।"

এই কথা ভাবিয়া বউটি খালি পাটার উপর পুতাখানা ঘষিতে আরম্ভ করিল আর সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কান্না শুনিয়া মুসাফির ভাবিল, না জানি বউটির কি হইয়াছে। সে বাড়ির ভিতর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা জননী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

বউটি বলিল, "বাবারে! সে কথা তোমাকে বলিবার নয়। আমার স্বামী মানা করিয়াছেন।"

মুসাফির বলিল, "মা! আমি তোমার ছেলে। আমার কাছে কোনো কথা গোপন করিও না।"

বউটি তখন আধেক কাঁদিয়া আধেক কাঁদিবার ভান করিয়া বলিল, "আমার স্বামী বাড়ির ভিতরে আসিয়া আমাকে বলিল, এই মুসাফির বড়ই লোভী। আমাদের পুতাখানা পাটায় ধার দিয়া চোখা করিয়া রাখ। মুসাফিরের গলার ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া দিব। যাহাতে সে আর

কাহারও মাছ দেখিয়া লোভ করিতে না পারে। তাই আমি কাঁদিতেছি। হায়! হায়! আমার স্বামী এই মোটা পুতা তোমার গলার ভিতরে ঢুকাইলে নিশ্চয় তুমি মরিয়া যাইবে, তাই আমি কাঁদিতেছি। কিন্তু স্বামীর হুকুম তো আমাকে মানিতেই হইবে।"

শুনিয়া মুসাফিরের তো চক্ষুস্থির। সে বলিল, "মা জননী! তুমি একটু আস্তে আস্তে পুতা ঘষ। আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া মুসাফির তাড়াতাড়ি লাঠি-বোঁচকা লইয়া দে চম্পট। এমন সময় বাড়ির কর্তা ফিরিয়া আসিয়া দেখে কাছারি ঘরে মুসাফির নাই। বউকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুসাফির চলিয়া গেল কেন ?"

বউ নথ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তুমি বাড়ি হইতে চলিয়া গেলে মুসাফির বলে কি, 'তোমাদের পুতাটা আমাকে দাও।' দেখ তো, আমাদের একটা মাত্র পুতা। তা মুসাফিরকে দেই কেমন করিয়া ? পুতা দেই নাই বলিয়া মুসাফির রাগিয়া চলিয়া গেল।"

স্বামী বলিল, "সামান্য পুতাটা দিলেই পারিতে। আমি না হয় বাজার হইতে আর একটি পুতা কিনিয়া আনিতাম। শিগ্‌গীর পুতাটা আমাকে দাও, আর মুসাফির কোন্ দিকে গিয়াছে বল!"

বউ পুতাটি স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "মুসাফির এই দিক দিয়া গিয়াছে।"

পুতাটি হাতে লইয়া সে সেই দিকে দৌড়াইয়া চলিল। খানিক যাইয়া দেখিল, মুসাফির অনেক দূরে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। সে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "ও মুসাফির, দাঁড়াও–দাঁড়াও–পুতা লইয়া যাও।"

শুনিয়া মুসাফির উঠিয়া পড়িয়া দৌড়। চাষী যতই জোরে জোরে বলে, "ও মুসাফির! পুতা লইয়া যাও!– পুতা লইয়া যাও!" মুসাফির আরও জোরে জোরে দৌড়ায়। সে ভাবে সত্যই চাষী তাহার গলায় পুতা ঢুকাইতে আসিতেছে। বোঁচকা-বুচঁকি বগলে ফেলিয়া সে মরিয়া হইয়া দৌড়ায়।

কে আগে ভুলে যাইবে

গুরু-শিষ্য নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা এক নূতন দেশে আসিল। গুরু শিষ্যকে চার আনা পয়সা দিয়া বাজার করিতে পাঠাইল।

কিছুক্ষণ পরে মুটের মাথায় এক প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া শিষ্য আসিয়া উপস্থিত। সেই বোঝার মধ্যে চাল, ডাল, ঘি, তেল, মাছ, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লা আরও কত কি!

গুরু আশ্চর্য হইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল! "মাত্র চার আনার বাজার করিতে দিয়াছিলাম, এত জিনিস কি করিয়া কিনিলে।"

শিষ্য উত্তর করিল, "গুরু ঠাকুর! বলিব কি? এদেশের সব জিনিসের দামই দু'পয়সা করিয়া সের। দুধের দামও দু'পয়সা সের, আবার ঘি, মাখন, সন্দেশ, রসগোল্লার দামও দু'পয়সা সের। সঙ্গে যে মুটে আনিলাম তাকেও মাত্র দু'পয়সা দিতে হইবে।"

গুরু বলিল, "শিগ্‌গীর রান্না কর।" রান্না হইলে খাইয়া-দাইয়া গুরু শিষ্যকে হুকুম করিল, "তাড়াতাড়ি কাপড় বোঁচকা বাঁধ। এখন এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।" শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গুরু ঠাকুর?" গুরু ঠাকুর বলিল, "যে দেশে সব জিনিসের এক দর সেখানে পণ্ডিত-মুর্খে কোনো তফাৎ নাই। চল, এদেশ ছাড়িয়া এখনই চলিয়া যাই।"

শিষ্য উত্তর করিল, "এমন সোনার দেশ আর কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। সব জিনিসের দাম এত সস্তা। আপনি যাইবেন তো যান। আমি এদেশ ছাড়িয়া কেথায়ও যাইব না। এখানে কিছুদিন সন্দেশ,

রসগোল্লা খাইয়া শরীরটা একটু তাজা করিয়া লই। আপনার কাপড় বোঁচকা বহিতে বহিতে শরীর আমার কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। আর আমি আপনার সঙ্গে থাকিব না।"

গুরু কত করিয়া বুঝাইল। কিন্তু গুরুর সঙ্গে গেলে শিষ্যের কি লাভ ? এমন সস্তা সন্দেশ, রসগোল্লার দেশ ছাড়িয়া সে স্বর্গেও যাইবে না।

অগত্যা গুরু একাই চলিয়া গেল। শিষ্য রোজ বাজার করিয়া ঘি, দুধ, মাছ, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লা খায়। অল্পদিনেই তাহার শরীর বেশ নাদুস-নুদুস হইয়া উঠিল।

এদিকে হইয়াছে কি? সেই দেশের এক চোর গেরস্ত বাড়িতে চুরি করিতে যাইয়া দেয়াল চাপা পড়িয়া মারা গেল। চোরের বউ রাজার কাছে যাইয়া নালিশ করিল, "রাজা মহাশয়! অমুকের বাড়ির দেয়াল চাপা পড়িয়া আমার স্বামী মারা গিয়াছে। আপনি ইহার বিচার করুন।"

রাজা তখন সেই গেরস্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গেরস্ত আসিলে রাজা বলিলেন, "তোমার দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা গিয়াছে। আমি তোমাকে শূলে যাওয়ার হুকুম দিলাম।" শূল হইল চোখা একটি লোহার ডাণ্ডা। তাহার উপরে যাইয়া গেরস্তকে বসিতে হইবে। সুতরাং শূলে বসিলেই গেরস্তের মৃত্যু হইবে।

রাজার হুকুম শুনিয়া গেরস্ত তো ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির। সে জোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! দেয়াল চাপা পড়িয়া যে চোর মরিয়াছে ইহা আমার দোষ নয়। যে রাজমিস্ত্রি আমার দেয়াল গড়িয়াছিল তাহারই অপরাধ। কারণ সে শক্ত করিয়া দেয়াল গড়ে নাই।"

রাজা বলিলেন, "এ কথা সত্য। তবে ডাক দাও সেই রাজ-মিস্ত্রিকে।"

রাজমিস্ত্রি আসিলে রাজা রাগিয়া মাগিয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখ রে রাজমিস্ত্রি! তুমি বড়ই অপরাধ করিয়াছ। এই গেরস্তের দেয়াল তুমি

শক্ত করিয়া গাঁথ নাই। তাই গেরস্তের বাড়ি চুরি করিতে আসিয়া চোর দেয়ালে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। তুমি একটি লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ। আমি তাই তোমাকে শূলে চড়িয়া মরার হুকুম দিলাম।"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজমিস্ত্রি উত্তর করিল, "মহারাজ, আমার কোনো কসুর নাই। যে জোগালদার আমার কাদা ছেনিয়া দিয়াছিল তাহারই অপরাধ। সে ঠিকমতো কাদা ছেনিয়া দেয় নাই বলিয়া দেয়াল মজবুত হয় নাই।"

রাজা বলিলো, "ডাক সেই যোগালদারকে।" রাজার হুকুমে যোগালদার আসিয়া রাজার সামনে খাড়া হইল। রাজা তখন বলিলেন, "দেখ রে যোগালদার! তুমি মস্ত অপরাধ করিয়াছ। ভালোমতো কাদা ছেনিয়া দেও নাই বলিয়া রাজমিস্ত্রি শক্ত করিয়া দেয়াল গাঁথিতে পারে নাই। সেই দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা গিয়াছে। আমি তোমাকে শূলে চড়িয়া মরার হুকুম দিলাম।"

ভয়ে তো যোগালদার কাঁপিতে লাগিল। বেচারী যোগালদার কাজ করিয়া সামান্যই বেতন পায়। তাহা দিয়া নিজেই বা খাইবে কি আর ছেলেমেয়েদেরই বা খাওয়াইবে কি। না খাইয়া খাইয়া তাহার শরীর কাঠের মতো শুক্‌নো ঠন্‌ঠনে।

তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! এই লোকটির শরীর শুক্‌নো শোলার মতো। একে শূলের উপর বসাইয়া দিলে শূলের মাথায়ই আটকাইয়া থাকিবে।"

রাজা তখন বলিলেন, "হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়ে না। আমি যখন আদেশ দিয়াছি তা পালন করিতেই হইবে! দেখ, রাজ্যের কোথায় বেশ মোটা-সোটা লোক আছে। তাহাকে আনিয়াই শূলে দাও।"

রাজার সেপাইরা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে সেই শিষ্যকে খুঁজিয়া পাইল। মাসখানেক ইচ্ছামতো ঘি, দুধ, মাখন খাইয়া তাহার শরীর তেল চকচকে হইয়াছে। রাজার পাইকেরা তাহাকে

ধরিয়া আনিয়া শূলের কাছে লইয়া গেল। সেখানে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে। রাজা, রাজার মন্ত্রী, কোটাল, কোটাল-পুত্র সকলেই আসিয়াছেন।

কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া গুরু ভাবিল, শিষ্যটিকে ফেলিয়া

আসিলাম। যাই দেখিয়া আসি সে কি হালে আছে। এক জায়গায় বহুলোক জড় হইয়াছে দেখিয়া গুরুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া গুরু অবাক হইলেন, তাঁর শিষ্যকে শূলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। তিন চারজন লোক শূলের চোখা লোহার কাঠির উপর সরবী কলা, ঘি আর মাখন মাখাইতেছে। শিষ্যকে শূলের উপর

বসাইয়া দিলেই চড়াত করিয়া সেই চোখা লোহার কাঠি তাহার নাড়ী-ভুড়ি ছিদ্র করিয়া শরীরের মধ্যে বিঁধিয়া যাইবে। গুরু ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, "আহা! এই শিষ্যটি বহুদিন তাহার কাপড়-বোঁচকা বহিয়া বেড়াইয়াছে। আজ বিপদের কালে তাহাকে কোনোই সাহায্য করিতে পারিব না?"

মনে মনে একটি ফন্দি করিয়া গুরু ঠাকুর সমস্ত লোকের ভিড় ঠেলিয়া সেই শূলের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল ; "তোমরা সর! সর! এই লোকটির বদলে আমি শূলে চড়িব।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শূলে চড়িতে চাও কেন?"

গুরু ঠাকুর বলিল, "আজ বসু পূবে। চান সূরুজ ডুবে। এমন সময় যে শূলে চড়িয়া মরিবে, সে এই দেশের রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। মহারাজ! দয়া করুণ। এই লোকটির বদলে আমাকে শূলে যাইতে দিন।"

রাজা বলিলেন, 'আমি রাজা বাঁচিয়া থাকিতে তুমি শূলে চড়িয়া মরিয়া আবার এদেশের রাজা হইয়া জন্মিবে? তা কখনও হইবে না। আমিই শূলে চড়িব।"

তখন মন্ত্রী বলেন, "না মহারাজ! আমি শূলে চড়িব।"

গুরু ঠাকুর বলেন, "না না, আমি শূলে চড়িব।"

তারপর রাজা বলেন, 'আমি', মন্ত্রী বলেন, 'আমি', গুরু ঠাকুর বলেন, 'আমি।' প্রায় আধঘন্টাতক্ উপস্থিত লোকেরা শুধু আমি, আমি শুনিতে লাগিল। তখন রাজা ধমক দিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া নিজেই যাইয়া শূলের উপর চড়িয়া বসিলেন।

গুরু ঠাকুর শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি সে দেশ ছাড়িয়া নিজের দেশে ফিরিয়া আসিল।

রহিমুদ্দীর ভাইর বেটা

চাচা আর ভাজতে সন্ধ্যাবেলায় দুইজনে আলাপ-সালাপ করিতেছে।

ভাজতে: চাচা! আজ বাজারে গিয়াছিলাম।

চাচা: যাবি না! তবে বাড়িতে বসিয়া থাকবি নাকি?

ভাজতে: একটা কুমড়া লইয়া গিয়াছিলাম।

চাচা: নিবি না? খালি হাতে বাজারে যাবি নাকি?

ভাজতে: একটা লোক আসিয়া কুমড়াটার দাম জিজ্ঞাসা করিল।

চাচা: দাম জিজ্ঞাসা করিবে না তবে কি বিনা পয়সায় কুমড়াটা লইবে?

ভাজতে: আমি আট আনা চাহিলাম।

চাচা: আট আনা চাবি না তবে কি মাঙ্না দিবি অত বড় কুমড়াটা?

ভাজতে: সে লোকটা দুই আনা বলিল।

চাচা: বলিবে না? অতটুকু কুমড়া তুমি আট আনা চাহিলেই সে নিবে কেন?

ভাজতে: আমি বলিলাম বাপের পুষ্যি কুমড়া খাইছ কোনোদিন?

চাচা: বেশ বলিয়াছিস্। এত বড় কুমড়াটা বেটা দুই আনা মাত্র দর করিল!

ভাজতে: এমন সময় এক পুলিশ আসিল।

চাচা: আসিবে না? তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে বলিয়াছ, বাপের পুষ্যি কোনোদিন কুমড়া খাইয়াছ? দেখ না কি হয়!

ভাজতে: পুলিশ আসিয়া কুমড়াটার দাম জিজ্ঞাসা করিল।

চাচা: দাম জিজ্ঞাসা করিবে না? পুলিশ বলিয়া কুমড়াটা মাঙ্না লইবে না কি?

ভাজতে: আমি কুমড়ার দাম আট আনা চাহিলাম।

চাচা: বেশ! বেশ! আমার ভাজতে! দাম চাহিবি না! পুলিশ দেখিয়া ডরাইবি না কি?

ভাজতে: পুলিশ দুই আনা দাম করিল।

চাচা: করিবে না? পুলিশ দেখিয়া তাহারা জিনিসের দাম দস্তুর জানে না? এতটুকু কুমড়া তার দাম দুই আনার বেশি আর কত হইবে?

ভাজতে: আমি বলিলাম বাপের পুষ্যি কুমড়া খাইয়াছ কোনোদিন?

চাচা: বেশ বলিয়াছিস্! পুলিশ বলিয়া ডরাইবি কেন? বেটা আট আনার কুমড়াটা দুই আনায় লইতে চায়?

ভাজতে: তখন পুলিশ আমাকে ধরিয়া খুব মার দিল।

চাচা: দিবে না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? পুলিশের সঙ্গে বাহাদুরী!

ভাজতে: মারিতে মারিতে আমাকে থানায় লইয়া গেল।

চাচা: থানায় লইয়া যাইবে না? পুলিশকে তুমি অপমান করিয়াছ।

ভাজতে: সেখানে গেলে বড় দারোগা আসিল।

চাচা: আসবে না? দেখ তোমার উপর আরও কি দুর্গতি হয়।

ভাজতে: বড় দারোগা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল।

চাচা: দিবে না? তুমি যে রহিমুদ্দীর ভাইর বেটা।

কে বাঘ মারিল

গ্রামে থাকে গোঁপেশ্বর বাবু। য়্যা লম্বা গোঁপজোড়া। মুখের দুইধার হইতে দুইটি গোঁপের গুচ্ছ বিশ তিরিশ হাত উপরে উঠিয়াছে। রোজ তেল আর আঠা লাগাইয়া গোঁপেশ্বর বাবু তার গোঁপজোড়াকে আরও শক্ত করিয়া রাখে।

গ্রামের ছোটরা গোঁপেশ্বর বাবুর বড়ই ভক্ত।

ওই আগডালে পাকা আমটি রাঙা টুক টুক করিতেছে। ঢিল দিয়া কিছুতেই সেটি পাড়া যাইতেছে না।

গোঁপেশ্বর বাবু পথ দিয়া যাইতে ছেলেরা তাকে ধরিয়া বলিল, আমটি পাড়িয়া দাও। গোঁপেশ্বর বাবু তার গোঁপে একটু তা দিয়া গোঁপজোড়া আমের সঙ্গে আটকাইয়া মারিল এক টান। অমনি আমটি পড়িয়া গেল। ছেলেরা কলরব করিয়া কুড়াইয়া লইল। শুধু কি আম! ওই আগডালের পাকা কুল, জাম গাছের জাম আর খেজুর গাছের কাঁদিভরা পাকা খেজুর! যখন দরকার গোঁপেশ্বর বাবুকে ডাকিয়া আনিলেই পাড়িয়া দেয়। সেই জন্য ছেলেদের দলে গোঁপেশ্বর বাবুকে লইয়া কাড়াকাড়ি।

এর মধ্যে হইল কি? কোথা হইতে গ্রামে আসিল এক দাড়িওয়ালা মিঞা। বিশ তিরিশ হাত লম্বা দাড়ি। চলিতে মাটিতে পড়িয়া যায়। যে পথ দিয়া যায় দাড়িতে পথের ধুলা-বালু ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়। পাড়ার বউ-ঝিরা তাকে বড়ই খাতির করে। দেখিলেই বলে, দাড়িওয়ালা মিঞা, আইস, আইস, পান খাইয়া যাও। দাড়িওয়ালা মিঞা বাড়িতে আসিলে বউদের আর উঠান ঝাঁট দিতে কষ্ট করিতে হয় না। উঠানের

উপর দিয়া ঘুরিয়া গেলেই উঠানের যা কিছু খড়কুটা ধুলা-বালি তার দাড়িতে জড়াইয়া উঠানখানাকে সাফ করিয়া দিয়া যায়। শুধু কি তাই! কারও বাড়িতে ছেলের ভাত খাওয়ানি, মেয়ের বিবাহ, বহু লোক খাওয়াইতে হইবে। মাছের জন্য আর জেলের পথ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। দাড়িওয়ালা মিঞাকে পুকুরে বা নদীতে নামাইয়া দিলেই হইল। রুই, কাতল, বোয়াল যত মাছ দাড়িওয়ালা মিঞার দাড়িতে আটকাইয়া আসিবে। তারপর ধরিয়া লইয়া যত পার রান্না কর–খাও। সেই জন্য বউদের মধ্যে দাড়িওয়ালা মিঞার খুব খাতির। ছোটরা কিন্তু গোঁপেশ্বর বাবুকেই ভালোবাসে।

সেবার হইল কি? দেশে আসিল এক নতুন রকমের বাঘ। আজ ওর ছাগল লইয়া যায়–কাল ওর গরু লইয়া যায়। শুধু কি তাই! ছোট ছেলে মায়ের কোলে বসিয়া বোতলে দুধ খাইতেছে ; কোথা হইতে বাঘ আসিয়া তাহার হাত হইতে বোতলটি কাড়িয়া লইয়া গেল। বাঘের জ্বালায় ছোটদের বিস্কুট, লজেন্স, চিঁড়ে, মুড়ি কিছুই খাইবার উপায় নাই। কোথা হইতে বাঘ আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। শুধু কি তাই। মুন্দিরার মায়ের পানের ডিবা, রহিমের মার তামাক পোড়ার কৌটা, করিম বুড়োর হুকো-কলকে কখন যে বাঘ আসিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল কেউ টের পাইল না। শোনা-শোন এই কথা রাজার কানে গেল।

রাজা সমস্ত দেশে ঢোল পিটাইয়া দিলেন। যে বাঘ মারিতে পারিবে তাকে হাজার এক টাকা পুরস্কার আর যে গ্রামে যে থাকে সে গ্রাম তাকে লাখেরাজ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ সে গ্রামের লোক রাজাকে খাজনা দিবে না। যে বাঘ মারিবে তাকেই দিবে। খবর শুনিয়া গোঁপেশ্বর তার গোঁপে তেল দিতে দিতে ভাবিল, যদি বাঘ মারিতে পারি তবে কি মজাই না হইবে! সমস্ত গায়ের লোক আমাকে খাজনা দিবে। আমি পায়ের উপর পা ফেলিয়া কেবল আরাম করিব।

দাড়িওয়ালা মিঞাও তাহার দাড়িতে তা দিতে দিতে ভাবিল, যদি বাঘ মারিতে পারি, তবে কি মজাই না হইবে। হাজার এক টাকার

ফুলেল তেল কিনিয়া কেবল দাড়িতে মাখাইব।

সন্ধ্যা হইলে গোঁপেশ্বর বাবু গ্রামের একধারে যাইয়া তাহার গোঁপজোড়া মেলিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

দাড়িওয়ালা মিঞা গ্রামের ওই ধারে বনের মধ্যে তাহার দাড়ির জাল ফেলিয়া বাঘের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাতের এক প্রহর গড়াইয়া দুই প্রহর হইল। বাঘের কোনো দেখা নাই। দুই প্রহর গড়াইয়া প্রভাত হয় হয়। বাঘের কোনো দেখা নাই। এধারে গোঁপেশ্বর বাবু গোঁপ মেলিয়া, ওধারে দাড়িয়াওয়ালা মিঞা

দাড়ির জাল মেলিয়া বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে।

এমন সময় হন্‌হন্‌ করিয়া বাঘ হুঙ্কার করিয়া গোঁপেশ্বর বাবুর সামনে আসিয়া তাড়া করিল। অমনি আর বাঘ যায় কোথায়? গোঁপেশ্বর বাবু বাঘের গলায় তার গোঁপজোড়া দিয়া গলফাঁস লাগাইয়া দিল। গোঁপসমেত গোঁপেশ্বর বাবু সমেত টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাঘ ছুটিল ওদিক পানে। ওদিকে তো দাড়িওয়ালা মিঞা দাড়ির জাল পাতিয়া বসিয়াই আছে। বাঘ যাইয়া আটকা পড়িল তাহার দাড়ির জালে। দাড়ি ধরিয়া বাঘকে টানিতে টানিতে দাড়িওয়ালা মিঞা যাইয়া রাজসভায় উপস্থিত।

"মহারাজ! ইনাম, বকশিশ্‌ দিন। বাঘ ধরিয়া আনিয়াছি।" দাড়ির তলা হইতে গোঁপেশ্বর বাবু চিৎকার করিয়া বলে, "মহারাজ! ও বাঘ ধরে নাই। আমি বাঘ ধরিয়াছি। এই দেখুন, আমার গোঁপের সঙ্গে বাঘ আটকাইয়া আছে।" এত টানা হেঁচড়ায় বাঘটি তখন মরিয়া গিয়াছে।

অবাক হইয়া সকলেই দেখিলেন, সত্যিই তো গোঁপেশ্বর বাবুর গোঁপের সঙ্গে বাঘ আটকাইয়া আছে।

তখন এ বলে, আমি বাঘ ধরিয়াছি–ও বলে, আমি বাঘ ধরিয়াছি। অনেক বিচার করিয়া রাজা বলিলেন, তোমরা কেউ কারো চাইতে কম নও। দুইজনেই পুরস্কার পাইবে।

পুরস্কার পাইয়া গোঁপেশ্বর বাবু আর দাড়িওয়ালা মিঞা গ্রামে সুখে বাস করিতে লাগিল।

দুইগাধা

এক চাষীর দুইটি গাধা ছিল। তাহারা একসঙ্গে মাঠে চরিয়া খাইত। মাঝে মাঝে একসঙ্গেই গান সাধিত। দুই জনের ভারি ভাব।

অবস্থা খারাপ হইলে চাষী গাধা দুইটি বেচিতে হাটে লইয়া আসিল। একটি গাধা কিনিল এক ধোপা। অপরটি কিনিল এক সার্কাসওয়ালা। সার্কাসওয়ালা গাধাটি লইয়া দেশে বিদেশে সার্কাস দেখাইতে চলিল। ধোপার গাধা দেশেই রহিল।

এক বৎসর পরে সার্কাসের দল দেশে ফিরিয়া আসিল।– ধোপার গাধার সঙ্গে সার্কাসের গাধার আবার দেখা হইল। এতদিন পরে দুইজনে দুইজনকে দেখিয়া ভারি খুশী। সার্কাসের গাধা ধোপার গাধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ভাই ?" ধোপার গাধা বলিল, "আরে ভাই! আমি ধোপার বাড়িতে বেশ সুখে আছি। দু'বেলা জাব, খইল আর ইচ্ছামতো ঘাস খাই। ধোপার বাড়িতে বেশি কাজ নাই। সকালে কাপড়ের বোঝা লইয়া নদীর ঘাটে যাই। সেখানে বোঝা নামাইয়া দিয়া এখানে সেখানে ঘাস খাইয়া বেড়াই। আর মনের আনন্দে গান গাই। বিকাল হইলে কাপড়ের বোঝা পিঠে লইয়া বাড়ি ফিরি। তারপর মহাভোজ। দেখিতেছ না, আমার শরীর কেমন নাদুস-নুদুস হইয়াছে। আচ্ছা ভাই! তোমাকে এমন শুক্‌না দেখাইতেছে যে?"

সার্কাসের গাধা বলিল, "সেকথা আর জিজ্ঞাসা করিও না ভাই। সার্কাসের লোকেরা ভালোমতো খাইতে দেয় না। তাহাদের যত মালপত্র আমার পিঠে চাপাইয়া এদেশে সেদেশে যাইতে হয়। ভালোমতো খাইতে পাই না। দিনে দিনে আমি কমজোর হইয়া পড়িতেছি।" ধোপার গাধা বলিল, "আচ্ছা ভাই! তুমি এই সার্কাসের দল ছাড়িয়া ধোপার বাড়িতে চলিয়া আসিলেই পার। এখানে কিছুদিন থাকিলে আমার মতোই তুমি খাইয়া দাইয়া নাদুসনুদুস হইবে।"

সার্কাসের গাধা বলিল, "কতবারই তো ভাবি তাহাই করিব। কিন্তু একটি আশায় সার্কাস দল ছাড়িতে পারি না।"

ধোপার গাধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশায় ভাই?"

সার্কাসের গাধা উত্তর করিল, "আমাদের সার্কাসওয়ালার মেয়েটি যখন দড়ির উপর উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করে তখন সার্কাসওয়ালা

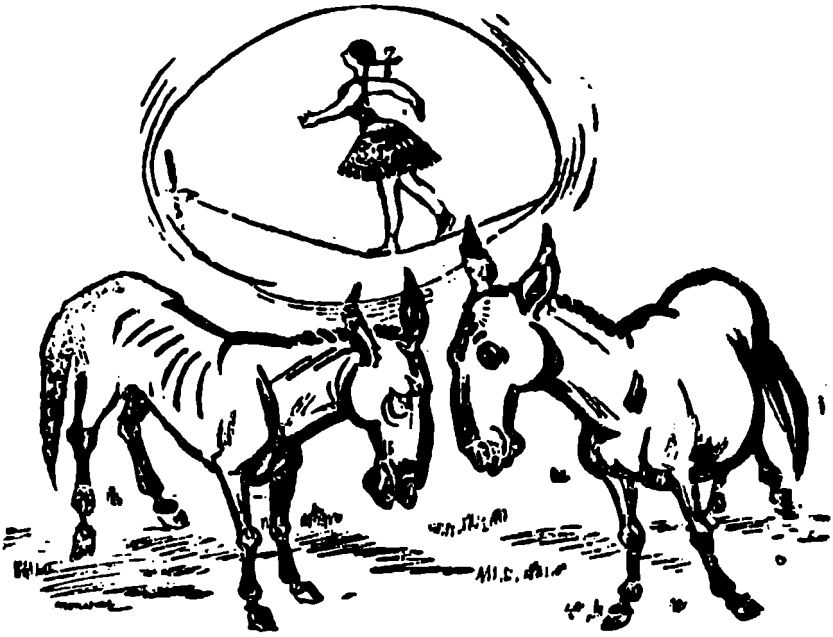

মেয়েটিকে বলে, "দেখ্, যদি তুই দড়ির উপর হইতে পড়িয়া যাইবি, এই গাধার সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।" সেই আশায় না খাইয়া নানা দুঃখকষ্ট সহিয়াও সার্কাসের দল ছাড়িতে পারি না। কিন্তু ভাই! এই এক বৎসরের মধ্যে একবারও সে দড়ি হইতে পড়িল না। যদি কোনো সময় মেয়েটি দড়ি হইতে পড়িয়া যায় সেই আশায়ই সার্কাসের দল ছাড়িতে পারিতেছি না।"

এরূপ মিথ্যা আশার লোভে বোকা লোকেরা বহু নির্যাতন ও অসুবিধা সহ্য করে।

কোন দেশে বোকা নাই

চাষীর একটি মাত্র মেয়ে। বড়ই আদরের। মেয়েটি একদিন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, তার যেন বিবাহ হইল। তারপর একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হইল। হঠাৎ জ্বর হইয়া ছেলেটি মারা গেল। যেই এই কথা ভাবা অমনি মেয়েটি আছাড়ি পাছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওরে আমার সোনারে! –ওরে আমার মানিকরে! তুই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলিরে।"

মেয়ের মা আসিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, "খুকী! তুই কেন কাঁদিতেছিস বল।" মেয়ে যখন মাকে সকল কথা বলিল, শুনিয়া মাও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

কান্না শুনিয়া চাষী বাড়ি আসিল। না জানি কি হইয়াছে। বউ আর মেয়ে চাষীকে দেখিয়া আরও জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল। চাষী যতই জিজ্ঞাসা করে তোমরা কেন কাঁদিতেছ, তাহারা ততই চিৎকার করিয়া কাঁদে। তখন চাষী ধমক দিয়া বলিল, "কেন কাঁদিতেছ শিগ্‌গীর বল।" তখন চাষীর বউ বলিল, "আমাদের মেয়ের তো বিবাহ হইবে। তখন তার কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে হইবে। জ্বর হইয়া ছেলেটি যদি মরিয়া যায় সেই জন্য আমরা কাঁদিতেছি।"

সমস্ত শুনিয়া চাষী বলিল, "আমাদের মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পরে তার ছেলে হইবে কি না, তাও কেহ জানে না। আর সেই ছেলে যে জ্বর হইয়া মরিবে তাও কেহ বলিতে পারে না। তোমাদের মতো এমন বোকা কোথায়ও দেখি নাই। এখন কান্না থামাইয়া ভাত রাঁধ। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

চাষীর বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "বেশ সুখে আছ তুমি। বলি ও মুখপোড়া! কোন্ মুখে তুমি ভাত গিলিবে? ছেলেটি যদি মারা যায় তবে বুড়ো বয়সে কে আমাকে, আমাদের মেয়েকে আর তোমাকে কামাই করিয়া খাওয়াইবে?"

বউ আর মেয়ে আবার কান্না আরম্ভ করিল। কেহই ভাত রাঁধিতে গেল না।

তখন চাষী বলে, "তোমাদের মতো এমন বোকা লোক লইয়া ঘর করা ঝক্‌মারি। এই আমি দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। যে দেশে তোমাদের মতো বোকা লোক নাই সেই দেশে যাইয়া বাস করিব। যদি এমন দেশ খুঁজিয়া না পাই তবে ফিরিয়া আসিব। নতুবা এই আমার শেষ বিদায়।"

সত্য সত্যই চাষী বাড়ি হইতে বাহির হইল। যাইতে যাইতে সে এক দেশে যাইয়া দেখে, নদীর ধারে লম্বা একটি কাঠ লইয়া বহুলোক টানাটানি করিতেছে। চাষী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এই কাঠ লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন?" তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, আমাদের রাজা এই নদীতে একটি পুল তৈরি করিতে হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু এই কাঠখানা নদীর এপারে ওপারে নাগাল পায় না। তাই উহা টানিয়া লম্বা করিতেছি। আজ সাতদিন হইতে আমরা এই কাজ করিতেছি। যত মজুর কাঠ টানিতে আসে রাজা তাহাদের বেতন দেন আর বলেন, "যত টাকা লাগে আমি দিব, কিন্তু কাঠ টানিয়া লম্বা করা চাই।"

চাষী সমস্ত শুনিয়া রাজসভায় যাইয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার লোকজন যতই টানাটানি করুক, কাঠ টানিয়া লম্বা করিতে পারিবে না। পুলও তৈরি হইবে না। আমি যাহা যাহা চাই যদি দেন তবে সাতদিনের মধ্যে আমি পুল তৈরি করিয়া দিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "বেশ, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। পুল তৈরি করিয়া দাও, তোমাকে বকশিশ্ করিব।"

চাষী রাজার লোকের নিকট হইতে কাঠ, লোহা আর চুন, সুরকি লইয়া বহু রাজমিস্ত্রী খাটাইয়া সাত দিনের মধ্যে পুল তৈরি করিয়া দিল। রাজা তখন খুশী হইয়া চাষীকে হাজার এক টাকা বকশিশ্ করিলেন। চাষী মনে মনে ভাবিল এটাও বোকার দেশ। সুতরাং চাষী সে দেশ ছাড়িয়া আর এক দেশে গেল।

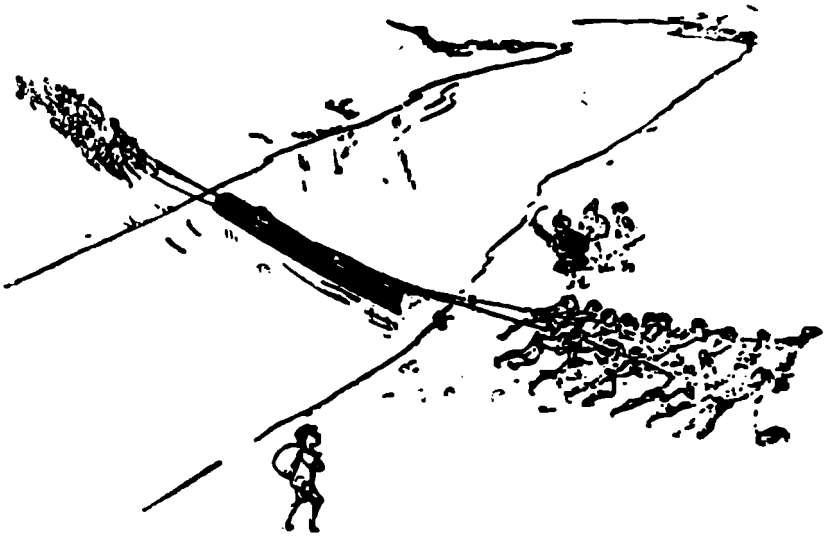

সেই দেশের রাজবাড়িতে যাইয়া চাষী দেখিতে পাইল, হাজার হাজার জেলে জাল ফেলিয়া কি যেন একটি ঘরের মধ্যে ফেলিতেছে। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া চাষী জানিল যে, দেশের রাজা একখানা নতুন কুঠুরী তৈরি করিয়াছেন। কিন্তু কোনো জানালা, দরজা না থাকায় ঘরের মধ্যে অন্ধকার। তাই রাজা হুকুম করিয়াছেন, বাহির হইতে আলো জালে আটকাইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিতে। হাজার হাজার জেলে প্রায় দুই মাস এই কাজ করিতেছে। কিন্তু ঘরে এখনো আলো হয় নাই। রাজা তাহাদের দ্বিগুণ বেতন দিয়া বলিয়াছেন, আরও যত লোক দরকার কাজে লাগাও। বাহির হইতে আলো আনিয়া ঘর আলো করা চাই।"

চাষী তখন রাজার কাছে যাইয়া বলিল, "মহারাজ! ঝাকি জাল আর খেপলা জাল লইয়া যতই বাহিরের আলো ঘরে ফেলিতে চেষ্টা করিবেন কিছুতেই ঘর আলো হইবে না। আমাকে যদি হুকুম করেন আমি ঘর আলো করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "বেশ! তা' যদি করিতে পার আমি তোমাকে হাজার এক টাকা বকশিশ্ করিব।"

চাষী তখন রাজমিস্ত্রী লইয়া রাজার ঘরে অনেকগুলি জানালা দরজা করিয়া দিল। রাজা ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ঘর আলোতে ঝলমল করিতেছে। রাজা খুশী হইয়া চাষীকে হাজার এক টাকা বকশিশ করিলেন। চাষী ভাবিল, "এটাও বোকার দেশ। এদেশেও থাকা চলিবে না।" চাষী সে দেশ ছাড়িয়া আর এক দেশে গেল।

পথে যাইতে যাইতে চাষী দেখে দুইটি হিন্দু মেয়ে কথা বলিতে বলিতে আগে আগে চলিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে একটি ছাগল।

তাহারা একজন অপরকে বলিতেছে, "দেখ বোন, আমার এই ছাগলের নাম রাখিয়াছি রাম। রামকে যেদিন কিনি সেদিন হইতেই আমাদের অবস্থা ভালো হইতে লাগিল। আমার স্বামী এখন ব্যবসা করিয়া লক্ষ টাকার মালিক।"

এই কথা শুনিয়া চাষী সেই স্ত্রীলোকটির সামনে যাইয়া পায় হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মাসীমা! আমি আপনার বোনপো। আপনি কোথায় যাইতেছেন ?" একটি ভালো পোশাক পরা লোক তাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিয়াছে। স্ত্রীলোকটি আনন্দে গদগদ হইয়া গেল। সে খুব স্নেহের সঙ্গে বলিল, "এই যে বোনপো! নদী হইতে রামকে স্নান করাইয়া বাড়ি ফিরিতেছি।"

চাষী বলিল, "মাসীমা, রামের বড় ভাই শ্যাম আমার কাছে আছে। আগে আমার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল কিন্তু শ্যামকে কেনার পর ক্রমেই আমার অবস্থা ভালো হইতেছে। এখন আমি লক্ষ টাকার মালিক।"

মাসী বলিল, "আমার রাম যখন আমাদের এত টাকা করিয়া দিয়াছে, তার বড় ভাই যে তোমার ভাগ্য ফিরাইয়াছে এতে আর আশ্চর্য কি!"

চাষী বুঝিল মাসী তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছে। সে তখন আরও কাছে যাইয়া বলিল, "মাসীমা! কাল আমার শ্যামের বিবাহ ঠিক করিয়াছি। কিন্তু শ্যাম বলিয়াছে, অমুক দেশে আমার ছোট ভাই আছে। তাকে যদি আনিতে পার তবেই আমি বিবাহ করিব। নতুবা কিছুতেই আমি বিবাহ সভায় যাইব না। এখন আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি। এদিকে বিবাহের জন্য অলঙ্কার পত্রও গড়াইয়াছি। লোক-জনও নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু ছোট ভাই রামকে ছাড়া শ্যাম কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় না। আপনি যদি এক দিনের জন্য আপনার রামকে আমার সঙ্গে দেন, বিবাহের পর কালই আমি রামকে ফিরাইয়া দিয়া যাইব।"

মাসী বলিল, "তা বাছা! লইয়া যাও। কিন্তু কালই রামকে লইয়া আসিও। রাম আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকিতে পারে না।"

চাষী কহিল, "সেকথা কি আর বলিতে! কাল আমি রামকে লইয়া আসিব।"

মাসীর হাত হইতে ছাগলের দড়ি ধরিয়া কিছুদূর যাইয়া চাষী আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মাসীমা! একটা কথা বলিব। কিছু মনে করিবেন না। রাম তো বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবে! অমনি খালি গায়ে যদি যায় লোকে কি বলিবে। আপনার হারছড়া যদি রামের গলায় পরাইয়া দেন, দেখিয়া লোকে আপনার তারিফ করিবে।"

মাসী তখন অপর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল তো বোন কি করা যায় ?" চাষী তখন নিজের পকেট হইতে দুই হাজার টাকা দেখাইয়া বলিল, "আমাকে বিশ্বাস করিতেছেন না ? দেখুন, আমার কত টাকা আছে! আমি গরীব লোক না।"

অপর স্ত্রীলোকটি বলিল, "এ লোকটির কথাবার্তা এত ভালো! একে বিশ্বাস করা যায়।"

মাসী তখন হারছড়াটি খুলিয়া ছাগলের গলায় পরাইয়া দিল।

চাষী ছাগলের দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে সামনের পথে আগাইয়া চলিল। অজানা লোকের সঙ্গে ছাগল কি যাইতে চাহে। সে এদিকে ঘাস দেখিয়া মুখ দেয়, ওদিকে মাঠ দেখিয়া ছুট দেয়। বিরক্ত হইয়া চাষী চাগলের গলা হইতে হারছড়াটি খুলিয়া লইয়া তাহাকে বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। তারপর হন্‌হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

এদিকে মাসী বাড়ি ফিরিতে তার স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ স্নান করিতে এত দেরি হইল কেন ? আমি এদিকে ক্ষুধায় মরিয়া যাইতেছি।"

এক গাল হাসিয়া মাসী বলিল, "পথে বোনপোর সঙ্গে দেখা হইল। তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে দেরী হইয়া গেল! রামের ভাই শ্যামের বিবাহ কি না ! তাই রামকে লইতে আসিয়াছিল।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলার সোনার হারছড়াটি তো দেখিতেছি না?"

বউ বলিল, "রামের বড় ভাইয়ের বিবাহ। সেখানে রামকে তো খালি গায় পাঠাইতে পারি না। তাই আমার গলার হারছড়া রামের গলায় পরাইয়া দিয়াছি। তুমি ভাবিও না। বোনপো কালই রামকে দিয়া যাইবে।"

স্বামী রাগিয়া কহিল, "তোমাকে যখন আমি বিবাহ করি তখন তো তোমার কোনো বোনপোর কথা শুনি নাই। এখন বোনপো আসিল কোথা হইতে ? তার নাম কি ? বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

বউ বলিল, "না তো! সে কথা তো জিজ্ঞাসা করি নাই।"

স্বামী বলিল, "তোমার মতো বোকা কোথাও দেখি নাই। সে লোকটা কোন দিকে গিয়াছে ?"

বউ বলিল, "সে উত্তরের দিকের রাস্তা দিয়া গিয়াছে।"

স্বামী তখন উত্তরের রাস্তা দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে চাষীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ ভাই! এই

পথ দিয়া একটি লোককে ছাগল লইয়া যাইতে দেখিয়াছ ? সেই ছাগলের গলায় একটি সোনার হার।"

চাষী বলিল, "দেখিয়াছি, সে এই পথ ঘুরিয়া ডাইনে গেল, তারপর বাম দিকে চলিল। আপনি একা গেলে তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। আমার পথ-ঘাট সবই জানা আছে। এক কাজ করুন। আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি ঘোড়া ছুটাইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসি।"

লোকটি চাষীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া ঘোড়াটি তাহাকে দিল।

চাষী ঘোড়ায় চড়িয়া দিল ছুট। যাইতে যাইতে সে ভাবিল, "সকল দেশেই তো আমার বউ-এর মতো বোকা লোক আছে। বোকা নাই এমন দেশ যখন কোথাও পাইলাম না, তখন বউ-এর কাছেই ফিরিয়া যাই।"

জোলার বুদ্ধি

জোলার এক গাই! জোলা তো সারাদিন তাঁত-খুঁটি লইয়া কাপড় বুনায়। গাইটিকে মাঠে চরাইতে যাইবে কখন? জোলা এক বুদ্ধি বাহির করিল। খুব লম্বা একটি দড়িতে বাঁধিয়া জোলা গাইটিকে রোজ সকালে ছাড়িয়া দেয়। গাই মাঠে যাইয়া সারাদিন ঘাস খায়। সন্ধ্যা হইলে জোলা দড়ি ধরিয়া টানিয়া গাইটিকে ঘরে আনে। এইভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। মাঠের নানা শস্যক্ষেতে খাইয়া গাইটি বেশ নাদুসনুদুস হইয়া উঠিল।

জোলার বাড়ির পাশে সাত ভাই চাষীর বাড়ি। জোলার গাইটিকে একদিন তাহারা জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর গাইটির নাড়ী-ভুঁড়ি হাড়-গোড় আর চামড়া সেই দড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল।

রোজ বিকাল বেলা জোলা রশি ধরিয়া টানিলে গাই আপনা হইতে চলিয়া আসে। আজ জোলা এত টানাটানি করে কিন্তু গাই আসে না। তখন জোলা আর জুলনী হেইও হেইও করিয়া কোনো রকমে সেই নাড়ী-ভুঁড়ি আর হাড়-চামড়ার পুঁটলিটি টানিয়া আনিল। জোলা আর জুলনী বুঝিল তাহাদের গাইটিকে সাত ভাই চাষীরা কাটিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। গাইটির জন্য তাহারা সারারাত বসিয়া কাঁদিল।

পরদিন সকালে জোলা সেই হাড়-গোড় আর চামড়া একটা ছালায় পুরিয়া হাটে লইয়া গেল বিক্রি করিতে। মরা গরুর হাড়-গোড় আর কে কিনিবে? তাছাড়া নাড়ী-ভুঁড়ি পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যে দেখে সেই জোলাকে মারিতে আসে। জোলা হাটের এ কোণা হইতে ও কোণায় যায়—ও কোণা হইতে সে কোণায় যায়। সকলেই দূর দূর

করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। কোথাও সেই হাড়-গোড় সে বেচিতে পারিল না। তখন সেই ছালা মাথায় করিয়া জোলা বাড়ি রওয়ানা হইল। পথের মধ্যে রাত্র হইল। বাড়ি যাইতে আরও বহু পথ বাকী। কিন্তু রাত্রিকালে পথ চলিতে ডর করে। সেই ছালাসমেত জোলা একটি বটগাছের ডালে যাইয়া বসিয়া রাত কাটাইবে ঠিক করিল।

অনেক রাতে সাত ভাই চোর এক বস্তা টাকা চুরি করিয়া আনিয়া সেই গাছতলায় আসিয়া বসিয়াছে টাকা ভাগ করিবার জন্য। তাহাদের দেখিয়া জোলা ভয়ে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় তার হাত হইতে সেই হাড়-গোড়ের বস্তা পড়িয়া গেল। তখন ভয়ে চোরেরা টাকার বস্তা ফেলিয়া দে চম্পট!

ভোর হইলে সেই টাকার বস্তা মাথায় করিয়া জোলা বাড়ি ফিরিয়া আসিল। জোলার বউ তো সেই টাকার বস্তা দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা। মনের খুশীতে জোলা আর জুলনী হাত ধরাধরি করিয়া সেই টাকার বস্তার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল! নাচিয়া নাচিয়া হয়রান হইয়া জোলা ভাবিতে লাগিল, এক ছালা টাকা সে গণিবে কেমন করিয়া? সে বউকে বলিল, "সামনের সাত ভাই ভাষীর বাড়ি হইতে চাউল মাপিবার একটি সের লইয়া আইস।"

হেলিতে দুলিতে জোলার বউ সাত ভাই চাষীর বউদের কাছে যাইয়া বলিল, "তোমাদের চাউল সেরটি দিবে?"

জোলার হাঁড়িতে এক সেরের বেশী দুই সের চাউল কোনোদিন তাহারা দেখিল না। তার বউ আসিয়াছে আজ সের লইতে! সাত ভাই চাষীর সাত বউ জুলনীকে ঘিরিয়া ধরিল, "কি মাপিবি লো সের দিয়া?"

গুমরে গড়াইয়া খুশীতে ছড়াইয়া জুলনী বলিল, "তোমরা তো আমাদের গাইটিকে মারিয়া খাইয়াছ। তারই হাড়গোড় লইয়া জোলা হাটে গিয়াছিল। তাহাই বেচিয়া জোলা এক ছালা টাকা লইয়া আসিয়াছে। তা এত টাকা আমরা গণিব কি দিয়া? তাই তোমাদের সেরটি লইতে আসিয়াছি।"

কথাটা বিশ্বাসও করা যায় না আবার অবিশ্বাসও করা যায় না। বাড়ির বড় বউ সেরের মধ্যে একটু আঠা লাগাইয়া দিল। যদি সত্য সত্যই জোলা টাকা পাইয়া থাকে তবে দু-একটি টাকা সেই আঠার সঙ্গে লাগিয়া থাকিবে।

বিকাল বেলা যখন জুলনী সেরটি ফিরাইয়া দিয়া গেল, সাত ভাই চাষীর বউরা দেখিয়া অবাক হইল। সত্য সত্যই সেরের তলায় একটি টাকা আটকাইয়া আছে।

শোনা শোন এই কথা সাত ভাই চাষীরাও শুনিল। তাহারা ভাবিল, একটা গরুর হাড়-গোড় বিক্রি করিয়া জোলা একছালা টাকা পাইয়াছে। আমাদের সাতটা বলদ আছে। ঐগুলির হাড়-গোড় বেচিয়া আমরা সাত ছালা টাকা পাইব।

সামনের হাটে সাত ভাই চাষী তাহাদের সাতটি হালের বলদ মারিয়া ঐগুলির হাড়-গোড় সাতটি ছালায় ভরিয়া হাটে লইয়া গেল বেচিতে। মরা গরুর হাড়-গোড় কে কিনিবে? হাটের লোকেরা তাহাদের মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

বাড়িতে আসিয়া সাত ভাই চাষীর বড়ই রাগ হইল। জোলা ফাঁকি দিয়া তাহাদের সাতটি বলদ মারাইল।

তাহারা আসিয়া জোলার কুঁড়েঘরখানি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া গেল।

পরদিন জোলা সেই পোড়া ঘরের ছাই একটি ছালায় ভরিয়া হাটে চলিল।

পথের মধ্যে রাজার পাইকেরা গরুর গাড়িতে করিয়া টাকার বস্তা লইয়া যাইতেছিল। জোলা তাহাদের কাছে যাইয়া বলিল, "ভাইরা! আমার বস্তাটি বড়ই ভারী লাগিতেছে। তোমাদের গাড়ির উপর একটু রাখিতে দিবে?"

জোলার কাকুতি-মিনতি দেখিয়া পাইকদের দয়া হইল—"আচ্ছা রাখ ভাই।"

জোলা ছাই-এর বস্তা টাকার গাড়িতে রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কতক দূর যাইতে গাড়ি যখন অন্য পথ ধরিবে জোলা তখন ছাই-এর বস্তা রাখিয়া একটা টাকার বস্তা মাথায় লইয়া পথ চলিতে লাগিল। এত বস্তার মধ্যে রাজার পাইকেরা টেরও পাইল না যে, জোলা টাকার বস্তা লইয়া গিয়াছে।

জোলা বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আগের মতো জুলনী টাকা মাপিবার জন্য সাত ভাই চাষীর বাড়ি হইতে সের চাহিয়া আনিল।

এবারও সের ফেরত দেওয়ার সময় সত্য সত্যই একটি টাকা সেরের তলায় আঠার সঙ্গে আটকাইয়া আসিল। সাত ভাই চাষী জোলার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে জোলা, এবার টাকার ছালা পাইলি কোথায়?"

জোলা একগাল হাসিয়া বলিল, "আরে ভাই, তোমরা আমার ঘরখানা পোড়াইয়া বড়ই উপকার করিয়াছ। সেই পোড়া ঘরের ছাই হাটে লইয়া গিয়াছিলাম। বিক্রি করিয়া এক ছালা টাকা পাইয়াছি।"

সাত ভাই চাষী তখন বাড়ি আসিয়া ভাবিতে বসিল, "দেখরে, জোলার একখানা ঘর পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া গেল তাহা বিক্রি করিয়া জোলা একছালা টাকা পাইয়াছে। আমাদের সাতখানা বড় বড় ঘর আছে। এগুলি পোড়াইলে সাত ছালারও বেশি ছাই হইবে। হাটে বিক্রি করিয়া আমরা সাত ছালা টাকা পাইব।"

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। দাউ দাউ করিয়া সাত ভাই চাষীর সাতখানা ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল। তখন সাত ভাই চাষী সাত ছালা ছাই লইয়া হাটে গেল।

"মিঞা সাহেবরা! আপনারা কেহ ছাই কিনিবেন?"

ছাই আবার কে কেনে? সকলেই দূর দূর করিয়া তাহাদের তাড়ায়। সেদিন বাতাস ছিল জোরে। সাত ভাই চাষীর ছালা হইতে একটি ছালার মুখ গেল খুলিয়া। অমনি বাতাসে ছাই উড়াইয়া এর চোখে তার চোখে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত হাটুরে লোকেরা

তখন সাত ভাই চাষীকে এ দিল কিল–ও দিল থাপ্পড়– সে দিল ঘুষি। কথায় বলে, হাটুরে লোকের মার। নুলোও আসিয়া নুলো হাতের একটা থাপ্পর দিয়া যায়। কোনোরকমে হাট হইতে পালাইয়া সাত ভাই চাষী বাড়ী ফিরিল। মারের চোটে রাত্রে তাহাদের জ্বর হইল।

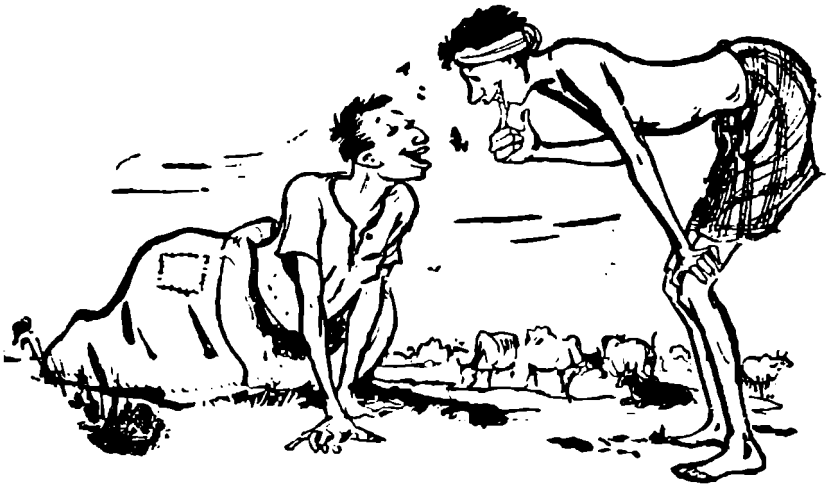

পরদিন সকালে সাত ভাই চাষী আবার পরামর্শ করিতে বসিল, নিশ্চয়ই জোলা তাহাদের ফাঁকি দিয়াছে। ফাঁকি দিয়া তাহাদের সাতখানা ঘর পোড়াইয়াছে। সাত ভাই চাষী খুব রাগিয়া, জোলাকে একটি ছালার মধ্যে ভরিল। তারপর সেই ছালা মাথায় করিয়া তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিতে লইয়া চলিল।

জোলা বড়ই ভারী। যে জোলাকে ছালা সমেত মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছিল সে আর পারে না। নদীর নিকটে আসিয়া ঢিপ্পিস করিয়া ছালাসমতে জোলাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর সামনের বাড়িতে সাত ভাই চাষী তামাক খাইতে গেল।

সেখানে এক রাখাল গরু চরাইতেছিল। জোলা ছালার ভিতর হইতে সেই রাখালকে ডাকিতে লাগিল। রাখাল ছালার মধ্যে মানুষ দেখিয়া অবাক বনিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তোমার এইরূপ অবস্থা কে করিল?"

ছালার ভিতর হইতে জোলা বলিল, "আরে ভাই! আমার দুঃখের কথা আর বলিবার নয়! আমি তো বিবাহ করিতে চাহি না, কিন্তু সাত ভাই চাষী আমাকে জোর করিয়া ছালায় ভরিয়া লইয়া যাইতেছে বিবাহ করাইবার জন্য।"

রাখাল বহুদিন হইতে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু বিবাহ করিতে তো অনেক টাকা লাগে। টাকা জোগাড় করিতে পারে নাই বলিয়া বিবাহ করিতে পারিতেছে না। সে বলিল, "আচ্ছা ভাই! এক কাজ করিলে হয় না ? তুমি ছালার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আস। আমি ছালার ভিতরে যাই। তোমার বদলে আমি বিবাহ করিয়া আসি। আমি ভাই বহুদিন হইতে বিবাহ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে বিবাহ করিতে পারি নাই।"

ছালার ভিতর হইতে জোলা বলিল, "তুমি ভাই আমাকে বাঁচাইলে। আমার বদলে তুমি যাইয়া বিবাহ করিয়া আইস। আচ্ছা, এক কাজ কর। তোমার হাতের কাস্তেখানা দিয়া ছালার মুখ কাটিয়া দাও।"

বোকা রাখাল তাহাই করিল। জোলা ছালার ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাখালকে ছালার মধ্যে ভরিয়া বেশ করিয়া ছালার মুখ বাঁধিয়া দিল। তারপর পাশের একটি ঝোপের মধ্যে পালাইয়া রহিল।

এদিকে সাত ভাই চাষী পাশের বাড়ি হইতে তামাক খাইয়া আসিয়া সেই ছালাসমেত রাখালকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। তাহারা ভাবিল, জোলা এবার সত্য সত্যই নদীতে ডুবিয়া মরিবে।

জোলা পাশের ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাখালের গরুগুলি লইয়া বাড়ি ফিরিল।

সাত ভাই চাষী ভাবে, জোলাকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। বেটা আবার একপাল গরু লইয়া ফিরিয়া আসিল। ব্যাপার কি ? জোলার কাছেই সমস্ত খবর শুনিতে হইবে।

সাত ভাই চাষী জিজ্ঞাসা করিতেই জোলা বলিল, "ভাই! ছালায় ভরিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া তোমরা আমার বড়ই উপকার করিয়াছ। আমি তো ছালাসমেত নদীর তলায় ডুবিয়া গেলাম। সেখানে দেখি কি, কত শত শত গরু চরিয়া বেড়াইতেছে। আমি আর কয়টা আনিতে পারি। এই গোটা পনেরো গরু তাড়াইয়া লইয়া বাড়ি আসিলাম। তোমরা সাত ভাই চাষী যদি থাকিতে তবে প্রায় সকল গরুই লইয়া আসিতে পারিতে।"

সাত ভাই চাষী তখন জোলাকে অনুরোধ করিল, "তুমি আমাদিগকে একে একে ছালায় পুরিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আস। দেখ ভাই! তোমার কথা মতো গরু মারিলাম– ঘর পোড়াইলাম। এখন আমাদের কিছুই নাই। এবার যদি তোমার মতো কিছু গরু লইয়া আসিতে পারি তবেই হালচাষ করিতে পারিব।"

জোলা তখন একে একে সাত ভাই চাষীকে ছালায় পুরিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তারপর দুই ছালা টাকা দিয়া আর গরু বাছুর লইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি

বাপ মরিয়া গিয়াছে। ঘুঘু আর ফাঁদ দুই ভাই। কি একটা কাজে দুই ভাইয়ের লাগিল মারামারি। ফাঁদ রাগিয়া বলিল, "তুই ঘুঘু দেখিয়াছিস কিন্তু ফাঁদ দেখিস নাই।"

ঘুঘু গোসা করিয়া বাড়ি হইতে পালাইয়া গেল। বিদেশে যাইয়া সে এ বাড়ি, সে বাড়ি, কত বাড়ি ঘুরিল। আমি ধান নিড়াইতে পারি–পাট কাটিতে পারি–গরুর হেফাজত করিতে পারি। কিন্তু কার চাকর কে রাখে! দেশে বড় আকাল।

অবশেষে ঘুঘু যাইয়া উপস্থিত হইল কিরপন মোল্লার বাড়ি। কিরপন মোল্লা চাকর রাখিয়া খাইতে দেয় না, খাইতে দিলেও তার বেতন দেয় না, তাই কেহই তাহার বাড়িতে চাকর থাকে না।

ঘুঘুকে দেখিয়া কিরপন মোল্লা বলিল, "আমার বাড়িতে যদি থাকিতে চাও তবে প্রতিদিন তিন পাখি করিয়া জমি চাষ করিতে হইবে, বেগুন ক্ষেত সাফ করিতে হইবে। আর যখন যে কাজ করিতে বলিব তাহাই করিতে হইবে। তেঁতুল পাতায় যতটা ভাত ধরে তাহাই খাইতে দিব। উহার বেশি চাহিলে দিব না। মাসে আট আনা করিয়া বেতন দিব। উহাতে রাজী হইলে আমার বাড়ি থাকিতে পার।"

আর কোথাও কাজ যখন জোটে না, ঘুঘু তাহাতেই রাজী হইল। কিরপন মোল্লা বলিল, "আমার আরও একটি শর্ত আছে। আমার কাজ ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। কাজ ছাড়িয়া গেলে তোমার নাক কাটিয়া লইব।"

ঘুঘু বলিল, "আমি এই শর্তেও রাজী আছি।"

কিরপন মোল্লা পাকা লোক। সে গ্রামের লোকজন ডাকিয়া সমস্ত শর্ত একটি কলা পাতায় লিখিয়া লইল।

তিন পাখি জমি চাষ করিতে ঘুঘুর প্রায় দুপুর গড়াইয়া গেল। তারপর গোছল করিয়া খাইতে আসিল। কিরপন মোল্লার বউ বলিল, "তেঁতুল পাতা লইয়া আস।" ঘুঘু একটি তেঁতুল পাতা আনিয়া সামনে বিছাইয়া খাইতে বসিল। তেঁতুল পাতায় আর কয়টি ভাত ধরে ? একে তো সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! এমন ক্ষুধা পাইয়াছে যে সমস্ত দুনিয়া গিলিয়া খাইলেও পেট ভরিবে না। সেই তেঁতুল পাতায় বাড়া চারটি ভাত মুখে দিয়ে ঘুঘু কিরপন মোল্লার বৌকে কাকুতি মিনতি করিল, "আর কয়টি ভাত দিন।" কিরপন মোল্লা অমনি তার কলা পাতায় লেখা শর্তগুলি পড়িয়া শুনাইয়া দিল। বেচারা ঘুঘু আস্তে আস্তে উঠিয়া বেগুন ক্ষেত সাফ করিতে গেল।

রাত্রে আবার সেই তেঁতুল পাতায় বাড়া ভাত। তার উপরে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। তিন চারদিন থাকিয়া ঘুঘু একেবারে আধমরা হইয়া পড়িল। তখন চাকরি না ছাড়িলে জীবন যায় ; কিন্তু যেই কিরপন মোল্লার কাছে চাকরি ছাড়ার কথা বলিয়াছে অমনি সে তার নাকটা কাটিয়া ফেলিল। নেকড়া দিয়া কোনোরকমে নাক বাঁধিয়া ঘুঘু দেশে ফিরিল।

তার ভাই ফাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে ! তোর নাকটা কাটা কেন?"

ঘুঘু কাঁদিয়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ফাঁদ বলিল, "ভাই! তুই বাড়ি থাক। আমি যাব কিরপন মোল্লার বাড়ি চাকরি করিতে।" ঘুঘু কত বারণ করিল। ফাঁদ তাহা কানেও নিল না। সে বলিল, "কিরপন মোল্লা ঘুঘু দেখিয়াছে কিন্তু ফাঁদ দেখে নাই। আমি তাহাকে ফাঁদ দেখাইয়া আসিতেছি।"

ফাঁদ যাইয়া কিরপন মোল্লার বাড়িতে উপস্থিত। "আপনারা কোনো চাকর রাখিবেন ?"

কিরপন মোল্লা বলিল, "আমার একজন চাকর ছিল সে অল্প কয় দিন হয় চলিয়া গিয়াছে। তা তুমি যদি থাকিতে চাও আমার কয়টি শর্ত আছে। তাহা যদি মানিয়া লও তবে তোমাকে রাখিতে পারি।"

ফাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি শর্ত ?"

কিরপন মোল্লা কলার পাতায় লেখা আগের চাকরের শর্তগুলি তাহাকে পড়িয়া শুনাইল।

"প্রতিদিন তিন পাখি করিয়া জমি চষিতে হইবে। বেগুন ক্ষেত সাফ করিতে হইবে। আর যখন যে কাজ বলিব তাহা করিবে! তেঁতুল পাতায় করিয়া ভাত দিব! মাসে আট আনা করিয়া বেতন। চাকরি ছাড়িয়া গেলে নাক কাটিয়া রাখিব।"

ফাঁদ সমস্ত শর্ত মানিয়া লইয়া বলিল, "আমারও একটি শত আছে। আমাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিতে পারিবে না। বরখাস্ত করিলে আমি তোমার নাক কাটিয়া লইব।"

কিরপন মোল্লা বলিল, "বেশ, তাহাতেই আমি রাজী।" সে পাড়ার আরও দশজনকে ডাকিয়া সাক্ষী মানিয়া আর একখানা কলা পাতায় সমস্ত শর্ত লিখিয়া লইল।

সকালে ফাঁদ চলিল ক্ষেতে লাঙল চষিতে। সে তিন পাখি জমির এদিক হইতে ওদিকে দিল এক রেখ, আর ওদিক হইতে এদিক দিল এক রেখ। এইভাবে সমস্ত জমিতে তিন চারটি রেখ দিয়া গরু-বাছুর লইয়া, বেলা দশটা না বজিতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, "ক্ষেতে লাঙল দেওয়া শেষ হইয়াছে। এখন আমাকে খাইতে দাও।"

কিরপন মোল্লার বউ বলিল, "আগে তেঁতুল পাতা লইয়া আস।"

ফাঁদ বলিল, "একটি ধামা দাও আর একখানা কুড়াল আমাকে দাও।" ধামা কুড়াল লইয়া ফাঁদ কিরপন মোল্লার উঠানের তেঁতুল গাছটির বড় ডালটি কোপাইয়া কাটিয়া ফেলিল। কিরপন মোল্লার বউ চেঁচাইতে লাগিল, "কর কি? কর কি? সমস্ত গাছটা কাটিয়া

ফেলিলে?" কার কথা কে শোনে। সেই কাটা ডাল হইতে মুঠি মুঠি তেঁতুল পাতা আনিয়া অর্ধেক উঠানে বিছাইয়া দিয়া বলিল, "এবার আমাকে ভাত দাও।"

কিরপন মোল্লার বউ সামান্য কয়টি ভাত একটি তেঁতুল পাতার উপর দিয়া যাইতেছিল। ফাঁদ বলিল, "আমার সঙ্গে চালাকি করিলে চলিবে না। শর্তে লেখা আছে তেঁতুল পাতায় করিয়া ভাত দিতে হইবে। কয়টা তেঁতুল পাতায় করিয়া ভাত দিতে হইবে তাহা লেখা নাই। সুতরাং তোমাদের উঠানে যতগুলি তেঁতুল পাতা বিছাইয়াছি তাহার সবগুলি ভরিয়া ভাত দিতে হইবে।"

কিরপন মোল্লা তার ভাঙ্গা চশমা জোড়া লইয়া সেই কলার পাতায় লেখা শর্তগুলি বহুক্ষণ পরীক্ষা করিল। ফাঁদ যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। সে তখন বউকে বলিল, "দাও, হাঁড়িতে যত ভাত আছে তেঁতুল পাতার উপর বাড়িয়া দাও।"

একবার ভাত দেওয়া হইলে ফাঁদ বলিল, "আরও ভাত আনিয়া দাও। সমস্ত তেঁতুল পাতা ভাতে ঢাকে নাই।" কিরপন মোল্লার বউ কি আর করে? হাঁড়িতে যত ভাত ছিল সব আনিয়া সেই তেঁতুল পাতায় ঢালিয়া দিল। ফাঁদ বলিল, "ইহাতে আমার পেট ভরিবে না। আরও ভাত আনিয়া দাও।" "আর ভাত হাড়িতে নাই।" কিরপন মোল্লা বলিল, "কাল তোমার জন্য আরো বেশি করিয়া ভাত রাঁধিব। আজ ইহাই খাও।"

ফাঁদ কতক খাইল–কতক ছিটাইয়া ফেলিল। তারপর ঢেঁকুর তুলিতে তুলিতে হাত মুখ ধুইতে লাগিল।

বিকালে কিরপন মোল্লা ফাঁদকে বলিল, বেগুন ক্ষেত সাফ করিতে। ফাঁদ যাইয়া সমস্ত বেগুন গাছ কাটিয়া ফেলিল। কিরপন মোল্লা হায় হায় করিয়া মাথায় হাত দিয়া বেগুন ক্ষেতের পাশে বসিয়া পড়িল। ফাঁদকে বলিল, "ও ফাঁদ! তুই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছিস।"

ফাঁদ বলিল, "তুমি আমাকে বেগুন ক্ষেত সাফ করিতে বলিয়াছ। সমস্ত বেগুন গাছ না কাটিলে ক্ষেত সাফ হইবে কেমন করিয়া?"

তার পরদিন কিরপন মোল্লা ফাঁদকে পাঠাইল ধান ক্ষেত নিড়াইতে। ফাঁদ ক্ষেতের সমস্ত ধান গাছ কাটিয়া ঘাসগুলি রাখিয়া আসিল।

সেদিন তাকে নদীতে পাঠাইল জাল ফেলিতে। জাল ফেলিতে মানে নদীতে যাইয়া জাল দিয়া মাছ ধরিতে। ফাঁদ সেই কথার উল্টা ব্যাখ্যা করিল। নদীতে যাইয়া সে কিরপন মোল্লার এত হাউসের খেপলা জালখানি ফেলিয়া দিয়া আসিল। কিরপন মোল্লা নদীতে যাইয়া এত খোঁজাখুঁজি করিল। অত বড় নদী কোথায় জাল তলাইয়া গিয়াছে! খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার ছেলেটি ধুলো কাদা গায়ে মাখিয়া নোংরা হইয়াছিল। কিরপন মোল্লা বলিল "ফাঁদ, যাও তো ছেলেটাকে সাফ করিয়া আন।"

ফাঁদ তার ছেলেটিকে পুকুরের কাছে লইয়া গিয়া পানিতে ডুবাইয়া ধোপার পাটে দিল তিন চার আছাড়। ছেলের হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিরপন মোল্লা তাড়াতাড়ি ফাঁদের হাত হইতে ছেলেকে ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে বকিতে লাগিল।

ফাঁদ বলিল, "আমাকে বকিলে কি হইবে ? আপনি ছেলেকে সাফ করিয়া আনিতে বলিয়াছেন। ধোপার পাটে না আছড়াইলে উহাকে সাফ করিব কেমন করিয়া ?"

রাত্রে কিরপন মোল্লা আর তার বউ মনে মনে ফন্দি আঁটে, কি করিয়া এই দুর্মুখা চাকরকে বিদায় করা যায়, কিন্তু কোনো উপায় নাই। তাকে বরখাস্ত করিলেই কলা পাতায় লেখা শর্তানুসারে সে কিরপন মোল্লার নাক কাটিয়া লইবে।

পরদিন সকালে কিরপন মোল্লা ফাঁদকে একটি বড় গাছ ফাড়িয়া চেলা বানাইতে হুকুম করিল। ফাঁদ গাছটি কাটিয়া চেলা বানাইল। তারপর চেলার বোঝা মাথায় করিয়া বাড়ি আসিল। কিরপন মোল্লার মা বারান্দায় বসিয়া পান চিবাইতেছিল। ফাঁদ তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খড়ির বোঝা কোথায় নামাইব ?"

সারা উঠান খালি পড়িয়া আছে। যেখানে সেখানে নামান যায়। তবুও ফাঁদ এই সামান্য ব্যাপারটির জন্যে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করায় বুড়ি ভীষণ রাগিয়া গেল। সে বলিল, "বুঝিতে পার না কোথায় নামাইতে হইবে ? আমার ঘাড়ে নামাও।"

যেই বলা অমনি ফাঁদ খড়ির বোঝা বুড়ীর ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিল। বুড়ী দাঁত কেলাইয়া মরিয়া গেল।

কিরপন মোল্লা ফাঁদকে কিছু বলিতেও পারে না। কারণ সে বুড়ীর আদেশ মতোই কাজ করিয়াছে। ফাঁদকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতে গেলেও সে তার নাক কাটিয়া লইবে। ফাঁদকে নিয়া কি করা যায়?

প্রতিদিন সে একটা না একটা অঘটন করিয়া বসে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিরপন মোল্লা ঠিক করিল, সে আর তার বউ মক্কা যাইয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ফাঁদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

যাইবার সময় কিরপন মোল্লা ফাঁদকে বলিল, "ফাঁদ! আমরা চলিলাম। তুই বাড়ি-ঘর দেখিস।" ফাঁদ জবাব দিল, "আর বলিতে হইবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে চলিয়া যাও। আমি সব দেখিব।"

কিরপন মোল্লা চলিয়া গেল। ফাঁদ তার ভাই ঘুঘুকে ডাকিয়া আনিয়া বাড়ির সর্বেসর্বা হইয়া বসিল। বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, কত রকমের গাছ। দুই ভাই সেই সব গাছের ফল বিক্রি করিয়া অনেক টাকা জমাইল। তার মধ্যে গ্রামে আসিল সেটেলমেন্টের আমিন। ফাঁদ কিরপন মোল্লার বাড়ি-ঘর, জমা-জমি সকল নিজের নামে লেখাইয়া লইল।

কিছুদিন পরে হজ সারিয়া কিরপন মোল্লা আর তার বউ দেশে ফিরিল। ফাঁদ তাহাদের বাড়িতে ঢুকিতে দিল না। সে বলিল, "এ বাড়ি তো আমাকে বেচিয়া গিয়াছ। দেখ না যাইয়া সেটেলমেন্টের অফিসে, সেখানে বাড়ি আমার নামে লেখা হইয়াছে।"

গচ্ছিত টাকা-পয়সা যা ছিল তা কিরপন মোল্লা মক্কা যাইয়া খরচ করিয়া আসিয়াছে। ফাঁদের সঙ্গে মামলা করিবার টাকা পাইবে কোথায়? আর মামলায় জিতিলেই বা কি হইবে? কলার পাতায় লেখা যে শর্তে সে ফাঁদের সঙ্গে আটকা পড়িয়াছে তাহা হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

কিরপন মেল্লার বাড়িতে ফাঁদ আর ঘুঘু সুখে বাস করিতে লাগিল। কিরপন মোল্লার উপর কাহারও কোনো দয়া নাই! কারণ সে বিনা অপরাধে ঘুঘুর নাক কাটিয়াছে। গ্রামের কাহাকেও কোনোদিন আধ পয়সাও দান করে নাই।

কিছুমিছু

বড় ভাই হরি শ্বশুরবাড়ি যায়। সেখানে কত খাতির-আদর। এটা-ওটা খাইয়া আসিয়া নানারকম গাল-গল্প করে। ছোট ভাই নেপাল শুনিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে। তার তো বিবাহ হয় নাই। কে তাহাকে খাতির-যত্ন করিবে ?

সেদিন নেপাল যাইয়া বড় ভাই হরিকে বলিল, "দাদা, প্রতিবার পূজায় তুমি শ্বশুরবাড়ি যাও। কত কি খাইয়া আস, এবার তোমার বদলে আমি যাব।" বড় ভাই বলিল, "আচ্ছা আমি এবার যাব না। তুই-ই আমার শ্বশুরবাড়ি বেড়াইয়া আসিস্।" শুনিয়া ছোট ভাই ভারি খুশি।

যাইবার সময় মা বলিয়া দিল, "দেখ্, তুই তো তোর দাদার শ্বশুর-বাড়ি যাবি। সেখানে বউমা আছে। খালি হাতে কেমন করিয়া যাবি! এই পাঁচটা টাকা নে। একটা কিছুমিছু কিনিয়া নিস।"

মা মনে করিয়াছিল, ছেলে বাজার হইতে কোনো কিছু কিনিয়া লইয়া যাইবে। সন্দেশ, রসগোল্লা বা অন্য কিছু। কিন্তু নেপাল ভাবিল, কিছুমিছু না জানি কি একটা নতুন জিনিস, বাজার হইতে কিনিয়া লইতে হইবে। সে বাজারে যাইয়া এ দোকানে যায় সে দোকানে যায়। মনোহারী দোকানে কত রঙ-বেরঙের জিনিস সাজানো রহিয়াছে। সে যাইয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কাছে কিছুমিছু আছে ?" দোকানী বুঝিতে পারে না কিছুমিছু কি। তাই উত্তর করে, "না, নাই।"

মনোহারী দোকান ছাড়িয়া সে মিষ্টির দোকানে যায়, হাঁড়ি পাতিলের দোকানে যায়, চাল-ডালের দোকানে যায়। "তোমাদের কাছে কিছুমিছু আছে ? তোমরা আমাকে পাঁচ টাকার কিছুমিছু দাও।"

"এমন বোকা তো কোথাও দেখি নাই। কিছুমিছু আবার দোকানে বিক্রি হয় ?" তাহারা কেহ তাহার গায়ে ধুলি ছিটাইয়া দিল, কেহ তাহার মাথায় কেরোসিন তেল মালিশ করিতে আসিল, কেহ তাহাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল।

মনের দুঃখে সে খালি হাতেই ভাই-এর শ্বশুর বাড়ি রওয়ানা হইল। পথে যাইতে যাইতে দেখা হইল এক পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি গামছায় কিছু ধান-দূর্বা, তুলসী পাতা, বেলপাতা, আর শাখা-সিন্দুর বাঁধিয়া চলিয়াছেন যজমান বাড়িতে শ্রাদ্ধের কাজ করিতে।

চুপ করিয়া পথ চলিতে হয়রান হইতে হয়। ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া পথ চলিলে পথের কষ্ট মনে পড়িবে না। সে ঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয়, গামছায় বাঁধিয়া কি লইয়া যাইতেছেন ?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কিছুমিছু লইয়া যাইতেছি।"

ছোট ভাই ভাবিল, এবার তবে সে কিছুমিছুর খোঁজ পাইয়াছে। সে ঠাকুর মহাশয়ের পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই কিছুমিছু দান করিয়া যান।" ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, "তাহা কেমন করিয়া হইবে, এগুলি তো আমার কাজে লাগিবে।"

ছোট ভাই তখন আরো অণুনয়-বিনয় করিয়া বলিল, "এই পাঁচটি টাকা লন, কিছুমিছু আমাকে দিতেই হইবে।"

পুরুত ঠাকুর ভাবিলেন, যজমান বাড়িতে পূজা করিয়া বড়জোর পাঁচ আনা পাইব। আর এই ছেলেটি পাঁচ টাকা সাধিতেছে। গামছায় বাঁধা ফুল, বেলপাতা তো যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। পথ হইতে তুলিয়া লইলেই হইবে। কিন্তু গামছায় কি বাঁধা আছে এই বোকা ছেলেটি যদি বুঝিতে পারে, তবে আর টাকা দিবে না। তাই প্রকাশ্যে তাহাকে বলিল, "এগুলির আমার দরকার ছিল, কিন্তু তুমি যখন এমন করিয়া বলিতেছ তোমাকে বেজার করিতে চাহি না। এই গামছা ধরিয়াই কিছুমিছু লইয়া যাও। পথে কোথাও খুলিও না। বাড়িতে লইয়া গিয়া তুলসী তলায় রাখিয়া দিও।"

মনের সুখে সেই গামছা সমেত ফুল বেলপাতা লইয়া ছোট ভাই খুব তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিল।

বড় ভাই-এর শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া সে পুঁটলিটি তুলসী তলায় রাখিয়া চুপটি করিয়া বসিযা রহিল। তার ভাই-এর বউ একাজে, সে-কাজে এদিকে আসিয়া দেখিল, দেবর তুলসী গাছের তলায় বসিয়া আছে।

"ওকি ! তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন? বাড়িতে সকলে কেমন আছে?" মাঐ আসিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে পুত্রা যে, তোমার দাদার তো আসার কথা ছিল। তা সে আসিল না কেন?"

ছোট ভাই তো দাদাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাহার বদলে কুটুম্ব বাড়িতে আসিয়াছে। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না। সে কোনো উত্তর না করিয়া তুলসী তলায় রাখা সেই পুঁটলিটি দেখাইয়া দিল।

পুঁটলিটি খুলিয়া দেখিয়া শাশুড়ী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায়! হায়! তার জামাই তো মরিয়া গিয়াছে, তাইতো পুত্রা ফুল-বেলপাতা আর শাঁকা-সিন্দুর লইয়া সেই খবর ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি দিতে আসিয়াছে। মায়ের কান্না দেখিয়া মেয়েও আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদিতে লাগিল। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন সকলে মিলিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। কেহ তলাইয়া দেখিল না কি হইয়াছে।

ছোট ভাই আসিয়াছিল দাদার শ্বশুর বাড়ি এটা-ওটা খাইতে, সে খাওয়ার কপালে ছাই। সকলে মিলিয়া কান্না জুড়িয়াছে। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বাড়ি আসিলে মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, বড় ভাই আসিয়া জিজ্ঞাসা করে–"সেখানে গেলি আর ফিরিয়া আসিলি, তারা সব ভালো আছে তো?"

ছোট ভাই বলিল, "সে বাড়িতে মানুষ মরিয়াছে। তারা সব কান্নাকাটি করিতেছে। তাই দেখিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি।"

"কে মরিয়াছে?" জিজ্ঞাসা করিতে ছোট ভাই বলিল, "তা আমি কি করিয়া বলিব? আমাকে দেখিয়া সকলে কাঁদিযা উঠিল। তাই আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম।"

বড় ভাই ভাবিল, নিশ্চয়ই তার বউ মরিয়াছে। তাই ভাইকে দেখিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর-বাড়ি ছুটিল। শাশুড়ী ও বউ তাহাকে দেখিয়া ঘিরিয়া ধরিল, "আমরা তো জানিতাম তুমি মরিয়া গিয়াছ!" বড় ভাই বউকে বলিল, "আমিও তো ভাবিয়াছিলাম তুমি মরিয়া গিয়াছ!" তখন সকলেই বোকা-ভাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইল।

প্রহারেন ধনঞ্জয়

এক কুলীন ব্রাহ্মণ। বড়ই গরীব। কোনোরকমে দিন চলিয়া যায়। বর্ষাকালে সাত মেয়ের সাত জামাই আসিয়া বসিয়া আছে তাহার বাড়িতে। বেচারি শ্বশুর আজ বিক্রি করে বউ-এর গয়না, কাল বিক্রি করে পিতলের কলসী। যা মূল্য পায় তাই দিয়া জামাইদিগকে খাওয়ায়। আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষার দিন। দুধে-মাছে খাইয়া জামাইরা আর ফিরিবার নামও করে না।

পাড়ার একজন লোক, গরীব ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। সে আসিয়া শ্বশুরকে বলিল, "আপনার জামাইরা যে আজ দশ-বারো দিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া খাইতেছে, তাহাদের বাড়ি চলিয়া যাইতে বলেন না কেন?"

শ্বশুর বলিল, "তাহা যদি করি তবে জামাইরা রাগিয়া মাগিয়া বাড়ি যাইয়া আমার মেয়েদের কষ্ট দিবে। সেই জন্যই তো তাহাদিগকে এতটুকু অযত্ন করিতে সাহস পাই না।"

তখন সেই লোকটি শ্বশুরের কানে কানে একটি উপদেশ দিয়া গেল। পরদিন জামাইদের খাইবার সময় পাতে ঘি পড়িল না। তাহা দেখিয়া হরি নামের জামাই রাগিয়া মাগিয়া অস্থির। সে ভাতের থালা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি–আজ আমাদের থালায় ঘি পড়িল না, ঘি না খাওয়াইয়া শ্বশুর আমাদিগকে অপমান করিলেন। এমন শ্বশুরবাড়ি কে থাকে ?" এই বলিয়া সে গাট্টি-বোচকা লইয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন জামাইদের খাইবার সময় পাতে মাংস পড়িল না। মাধব নামের জামাই ভাতের থালা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি–শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছি বলিয়া অপমানিত হইব? কাল খাইবার সময় ঘি দিল না, আজ আবার মাংস দিল না। এমন শ্বশুরবাড়ি নাই থাকিলাম।" এই বলিয়া সে ছাতি লাঠি বগলে করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

পরদিন খাইবার সময় মাছ দেওয়া হইল না। সেদিন রাগিয়া মাগিয়া মধু নামের জামাই চলিয়া গেল। তার পরদিন খাইবার সময় মিষ্টান্ন দেওয়া হইল না। উহাতে অপমান বোধ করিয়া যাদব নামের জামাই চলিয়া গেল। অপর দিন পাতে ব্যঞ্জন পড়িল না। অক্ষয় নামের জামাই রাগিয়া আগুন হইয়া চলিয়া গেল। বাকী দুই জামাই শ্যাম আর ধনঞ্জয় তবু পড়িয়া রহিল। বাড়িতে গেলে ভাতও তো

জুটিবে না। না দিয়াছে তরকারি, না দিয়াছে ঘি। এখানে নুন দিয়াও তো পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া যাইবে!

পরদিন যখন খাইবার সময় নুন দেওয়া হইল না, বিনা নুনে ভাত খাইতে খাইতে থু-থু করিয়া শ্যাম নামের জামাই চাদর গলায় দিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু ধনঞ্জয় আর যায় না। শ্বশুর না দিয়াছে নুন, পেট ভরিয়া ভাত তো দিবে! বাড়িতে যাইয়া ভাতও তো জুটিবে না। আর শ্বশুর বাড়িতে টিনের ঘর, ঝড়-বৃষ্টিতে জল পড়ে না। বাড়িতে খড়ের ঘর! ছাউনি খসিয়া পড়িয়াছে। এতটুকু বৃষ্টি পড়িলেই মেঝেয় হাঁটুখানেক জল। শ্বশুর বাড়িতে আরাম করিয়া তো রাতে ঘুমান যায়।

পরদিন সেই লোকটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পরামর্শ-মতো কাজ করিয়া ফল পাইয়াছ তো?" শ্বশুর বলিল, "আপনার পরামর্শমতো কাজ করায় সকল জামাই-ই একে একে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ধনঞ্জয় নামের জামাই কিছুতেই যায় না।" লোকটি তখন পরামর্শ দিল, "উহাকে লাঠিপেটা করিয়া তাড়াও।" কাঁহাতক আর কতদিন জামাইকে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়ান যায়! পরদিন শ্বশুর একটি লাঠি দিয়া মারিয়া ধনঞ্জয়কে তাড়াইয়া দিল। সেই হইতে শ্লোক তৈরি হইল।

হরি বিনা হরির্যাতি মাংসেন মাধব,
মৎস্য বিনা মধুর্যাতি মিষ্টান্ন বিনা যাদব।
ব্যঞ্জন বিনা তড়িৎ যাতি ক্রোধদ্দীপ্ত অক্ষয়,
লবণ বিনা শ্যাম যাতি প্রহারেণ ধনঞ্জয়।

শেয়ালদা পীরের দরগা

রহিম এক ঝাঁকা সুপারি লইয়া হাটে যাইতেছিল। মাঠের মধ্যে যেখানে তিন পথ একত্র হইয়াছে সেখানে শেয়ালে পায়খানা করিয়া রাখিয়াছে। এইখানে আসিয়া সে হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহার ঝাঁকার সুপারিগুলি কতক এধারে ওধারে পড়িয়া গেল। আর কতক সেই শেয়ালের বিষ্টার উপর পড়িল। রহিম তখন এধার ওধার হইতে সুপারিগুলি তুলিয়া লইল। শেয়ালের বিষ্টার উপর যেগুলি পড়িয়াছিল সেগুলি আর তুলিল না ; তারপর তাড়াতাড়ি হাটে চলিয়া গেল।

ইহার পরে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল এক পানের ব্যাপারী। সে পথের মধ্যে কতকগুলি সুপারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিল, নিশ্চয় জায়গাটিতে কোনো পীর আওলিয়া আছেন। কেহ হয়তো জানিতে পারিয়া এই সুপারিগুলি সেই পীরকে দিয়া গিয়াছে। তখন সে মাথার ঝাঁকা হইতে কতকগুলি পান সেই সুপারির পাশে রাখিয়া অতি ভক্তিভরে সালাম করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পরে পেঁয়াজের ব্যাপারী, রসুনের ব্যাপারী, মরিচের ব্যাপারী যে-ই এই পথ দিয়া যায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সেই সুপারি-পানের উপর রাখিয়া যায়।

হাট হইতে ফিরিবার পথে রহিম দেখে কি, পানে, পেঁয়াজে, রসুনে, মরিচে, তরি-তরকারিতে সেই স্থানটি এক হাত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে! সে তাড়াতাড়ি পানি, মরিচ, পেঁয়াজ, তরি-তরকারি যাহা পারিল ঝাঁকায় ভরিয়া লইয়া বাড়ি চলিল।

বাড়িতে গেলে রহিমের বউ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "গেলে তো কয়েক পন সুপারি লইয়া। তার দাম দিয়া এত জিনিস আনিলে কেমন করিয়া?"

রহিম বলিল, "ও সব কথা পরে হইবে! শীগ্‌গীর তোমার শাড়ী-খানা দাও। আমাদের কপাল ফিরিয়াছে।" সে তাড়াতাড়ি বউ-এর শাড়ী আর নৌকার পাল লইয়া সেই তিন পথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া আশ্চর্য হইল, ব্যাপারীরা যে যে আজিকার হাটে লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকে দু'আনা এক আনা করিয়া এই পথের উপরে রাখিয়া গিয়াছে! রহিম তাড়াতাড়ি পয়সাগুলি গাঁটে বাঁধিয়া সেই জায়গাটির চারি ধারে বউ এর শাড়ী দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। উপরের চাঁদোয়ার মতো করিয়া নৌকার পালটি টানাইয়া দিল।

পরদিন গ্রামের লোকে অবাক হইয়া দেখিল, মাঠের মধ্যে পীরের আস্তানা। মাথায় কিস্তি টুপী পরিয়া, গলায় ফটিকের তস্‌বী দোলাইয়া রহিম শেখ সেই আস্তানার সামনে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। যখন সেখানে বহু লোক জড়ো হয়, রহিম চক্ষু মেলিয়া বলে, "আহা! শেয়ালসা পীরের কি কুদরৎ। যে এখানে এক আনা মানত করিবে, একশ আনার বরকত পাইবে। আজ রাতে শেয়ালসা পীর আমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছে, এখানকার ধূলি লইয়া গায়ে মাখিলে সকল অসুখ দূর হইবে। যার ছেলেপেলে হয় না তার কোলে সোনার যাদু হাসিবে।"

গ্রামের লোকেরা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কিন্তু কেহই ইহার আসল ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিল না। বিশ্বাস করিয়া যাহারা এখানে রোগ-আপদের জন্য মানত করিল, কাহারও ফল হইল, কাহারও হইল না। যাহাদের ফল হইল তাহারা আরও বাড়াইয়া শেয়ালসা পীরের তেলেসমাতির কথা লোকের কাছে বলিল। রোগ হইলে আপনা হইতে তো কত লোক সারিয়া উঠে। আপদে বিপদেও তো আপনা হইতেই কত লোক উদ্ধার পায়। তাহারা ভাবে শেয়ালসা পীরের দোয়ায়-ই তাহাদের রোগ সারিতেছে—তাহাদের আপদ-বিপদ চলিয়া যাইতেছে। দিনের পর দিন পীরের নাম যেমন দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, মানত ও হাজতের টাকা পাইয়া রহিম শেখের অবস্থা ততই বাড়িতে থাকে। একবার একজন বড়লোক এখানে মানত করিয়া

মামলায় জিতিল। সে বহু টাকা খরচ করিয়া শেয়ালসা পীরের দরগা পাকা করিয়া দিয়া গেল। রহিম শেখ এই দরগার খাদেম। সে চক্ষু বুঁজিয়া মনে মনে ভাবে, "দেশের লোকগুলি কি বোকা! শেয়ালের

বিষ্টার উপরে এই দরগা। এখানে আসিয়া কত আলেম-মৌলবী, পীর-ফকীর মাথা কুটিয়া সেজ্‌দা করে।"